সন্তু-কাকাবাবু সিরিজ

আগ্নেয়গিরির পেটের মধ্যে

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

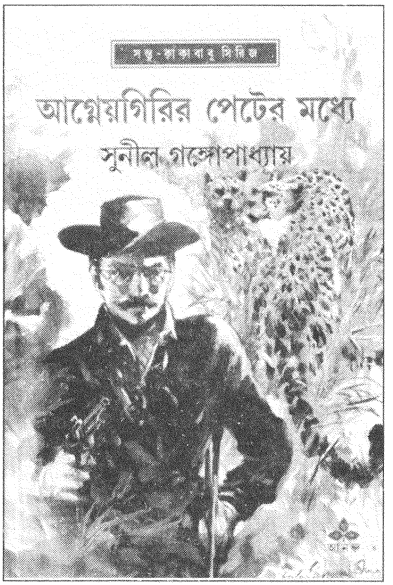

আগ্নেয়গিরির পেটের মধ্যে

এবারে প্রথম থেকেই নানারকম বাধা পড়তে লাগল। কাকাবাবু কোনও একটা ব্যাপারে মন ঠিক করে ফেললে আর ধৈর্য ধরতে পারেন না।

কলকাতা থেকেই প্লেন ছাড়তে দেরি হল প্রায় দেড়ঘণ্টা। না, একঘণ্টা চল্লিশমিনিট। কাকাবাবু ছটফট করছিলেন। আবার এ-কথাও ভাবছিলেন, মানুষের জীবনে দেড়ঘণ্টা কী এমন সময়, চুপচাপ বসে থাকলেই তো হয়। তবু তিনি ছটফট করছিলেন।

কলকাতা থেকে মুম্বই গিয়ে কাকাবাবুকে আবার বিদেশের প্লেন ধরতে হবে। মাঝখানে মাত্র তিনঘণ্টার ব্যবধান। তার মধ্যে থেকে একঘণ্টা চল্লিশমিনিট তো খরচ হয়েই গেল। মুম্বইয়ে আবার এক এয়ারপোর্ট থেকে যেতে হবে অন্য এয়ারপোর্টে, সেখানে দেরি হলে বিদেশের প্লেনটা ছেড়ে চলে যাবে।

রাগারাগি করে কোনও লাভ নেই। প্লেনটা কলকাতার আকাশে ওড়ার পর ঘোষণায় বলা হল, দেরির জন্য আমরা দুঃখিত। ব্যস! শুধু 'দুঃখিত' বলেই ওদের দায় সারা হয়ে গেল। এদিকে যে এজন্য কত মানুষের কত ক্ষতি হয়, তার দাম কে দেবে?

কাকাবাবু মনে মনে ঠিক করে রাখলেন, যদি তিনি বিদেশে যাওয়ার প্লেন ধরতে না পারেন, তা হলে এই বিমান কোম্পানির নামে অভিযোগ জানাবেন।

দুপুরবেলা। জানলার বাইরে ঝকঝক করছে রোদ আর নীল আকাশ, একফোঁটাও মেঘ নেই। কাকাবাবু জানলার ধারেই বসা পছন্দ করেন। বই পড়তে পড়তে মাঝে মাঝে বাইরের দিকে তাকালে অনেকখানি আকাশ দেখা যায়। মনটা ভাল হয়ে যায় তাতে।

কাকাবাবু এবার বিদেশে পড়বার জন্য রাজশেখর বসুর 'রামায়ণ' আর 'মহাভারত' এই বই দু'খানা নিয়ে এসেছেন। প্লেনে সবাই ইংরেজি বই পড়ে। রামায়ণ-মহাভারত বারবার পড়তেও খুব ভাল লাগে কাকাবাবুর।

আগেকার দিনে প্লেনে উঠলে যাত্রীদের কতরকম খাতির-যত্ন করা হত। এখন আর সেসব কিছু নেই। অনেক প্লেনে খাবারও দেয় না। কিনে খেতে হয় স্যান্ডুইচ ফ্যান্ডুইচ। কাকাবাবু মন দিয়ে মহাভারত পড়তে লাগলেন, ওসব নিয়ে আর মাথা ঘামালেন না।

হঠাৎ একসময় প্লেনটা বেশ জোরে দুলে উঠল।

কাকাবাবু বই থেকে চোখ তুলে বাইরে তাকিয়ে দেখলেন, এর মধ্যে আকাশ ভরে গিয়েছে কালো মেঘে। মাঝে মাঝে ঝলসে উঠছে বিদ্যুৎ।

এ দৃশ্যও দেখতে বেশ ভাল লাগে। মাটি থেকে আমরা উপরের দিকে তাকিয়ে দেখতে পাই বিদ্যুৎ। এখানে বিদ্যুতের ঝলক একেবারে পাশে পাশে। বজ্রের গর্জন অবশ্য ঠিক শোনা যায় না বিমানের আওয়াজের জন্য।

ক্যাপ্টেনের ঘোষণা শোনা গেল, "সবাই সিটবেল্ট বেঁধে নিন, অনুগ্রহ করে যে-যার নিজের জায়গায় বসে পড়ুন।"

কাকাবাবুর পাশে বসে আছেন একজন মাঝবয়সি মহিলা আর একটি একুশ-বাইশ বছরের মেয়ে। খুব সম্ভবত মা আর মেয়ে।

ভদ্রমহিলার মুখখানা শুকিয়ে গিয়েছে। মনে হয় ভয় পেয়েছেন। বিমানটা রীতিমতো দুলছে। এক-একবার মনে হচ্ছে যেন নেমে যাচ্ছে অনেক নীচে, ধপাস করে পড়ে যাবে মাটিতে। আবার উঠে যাচ্ছে উপরে।

বোঝাই যাচ্ছে, ভদ্রমহিলার বেশি বিমানে চাপার অভ্যেস নেই কিংবা এরকম আবহাওয়ায় কখনও পড়েননি। পাশের মেয়েটির কিন্তু মুখে ভয়ের চিহ্ন নেই। দু'জনে ফিসফিস করে কথা বলছেন।

একবার মহিলাটি কাকাবাবুর দিকে তাকিয়ে চাপা গলায় বললেন, "এখন কী হবে?"

কাকাবাবু একটু হেসে বললেন, "বেশি চিন্তা করবেন না। খুব ঝড়-বৃষ্টি হচ্ছে, তাই প্লেনটা এত দুলছে। একটু পরে দেখবেন, প্লেনটা আরও উপরে উঠে যাবে। সেখানে মেঘটেঘ কিছু থাকবে না, সব শান্ত হয়ে যাবে।"

মেয়েটি বলল, "থার্টি থাউজ্যান্ড ফিটের উপর আর মেঘ থাকে না।"

মহিলাটি বললেন, "এই আমার মেয়ে, পুনেতে একটা ভাল চাকরি

পেয়েছে, সেইজন্য যাচ্ছি। এখন তো মনে হচ্ছে, কলকাতার চাকরিই ভাল ছিল।"

কাকাবাবু বললেন, "না না, আমাদের ছেলেমেয়েরা বাইরে যাবে না কেন? আজকাল কত মেয়ে তো বিদেশেও একা একা পড়তে কিংবা কাজ করতে যাচ্ছে। আপনার মেয়ে তো ভয় পায়নি।"

ভদ্রমহিলা লজ্জা পেয়ে চুপ করে গেলেন।

একটু পরেই বিমানটি উপরে উঠে গেলে দুলুনি বন্ধ হয়ে গেল। কাকাবাবু জানলা দিয়ে দেখলেন, এখন বিদ্যুৎ-চমক দেখা যাচ্ছে অনেক নীচে।

আরও কিছুক্ষণ পরে ক্যাপ্টেন আবার ঘোষণা করলেন, "আমরা মুম্বইয়ের কাছে এসে পড়েছি। কিন্তু নামার একটু অসুবিধে হচ্ছে, এখানকার আবহাওয়া বেশ খারাপ।"

আবার শুরু হল দুলুনি, আবার প্লেনটা উঠে যাচ্ছে উপরে। বোঝাই যাচ্ছে, মুম্বইয়ের আকাশে সেটা ঘুরছে।

কাকাবাবু অস্থির হয়ে উঠলেন। ঝড়-বৃষ্টিতে ভয়ের কিছু নেই, তিনি জানেন। এরকম অভিজ্ঞতা তাঁর আগেও হয়েছে। কিন্তু আবার তো দেরি হয়ে যাচ্ছে। বিদেশের বিমানটা কি আর ধরা যাবে?

তবে, এরকম খারাপ আবহাওয়া থাকলে সেই প্লেনটাও ছাড়তে নিশ্চয়ই দেরি হবে।

কলকাতার আকাশ দেখে বোঝাই যায়নি যে, মুম্বইয়ের আবহাওয়া এত খারাপ হবে! এত বড় দেশে এরকমই হয়। এক জায়গায় যখন বরফ পড়ে, তখন অন্য কোনও জায়গায় গরমে গা জ্বলে যায়।

প্রায় পঞ্চাশ মিনিট প্লেনটা আকাশে চক্কর দেওয়ার পর পাইলট খুব সাহস করে নামিয়ে দিলেন রানওয়েতে। ঝড় একটু কমলেও সমান তোড়ে পড়ছে বৃষ্টি। রানওয়েতে জল জমে গিয়েছে, এর মধ্যে চাকা স্লিপ করে যাওয়ার খুব আশঙ্কা ছিল।

হাতে আর একঘণ্টারও কম সময়, কাকাবাবুকে এক্ষুনি ছুটতে হবে অন্য এয়ারপোর্টে। আগে নিতে হবে তাঁর সুটকেস।

সেখানে এসে কাকাবাবু শুনতে পেলেন ঘোষণা, এক-একটা ফ্লাইট ক্যানসেলড হয়ে যাচ্ছে। বৃষ্টি থামার পর রানওয়ে থেকে জল না নেমে গেলে আজ আর কোনও প্লেন উড়বে না।

কাকাবাবু একটু অপেক্ষা করেই শুনলেন, তাঁর বিদেশের ফ্লাইটও

ক্যানসেলড হয়ে গিয়েছে। আগামীকাল কখন যাবে, তা জানানো হবে পরে।

কাকাবাবু নিরাশ হয়ে আপনমনেই বললেন, "যাঃ!"

ফ্লাইট ক্যানসেল্‌ড হলে কতরকম ঝঞ্ঝাট হয়! বিদেশের এয়ারপোর্টে যারা কাকাবাবুকে নিতে আসবে, তারা ফিরে যাবে। হোটেলে বুক করা আছে, তারাও যদি ক্যানসেল করে দেয়?

কিন্তু প্রকৃতির উপর তো রাগ করা যায় না। এমন ঝড়-বৃষ্টিকে সব প্লেন কোম্পানিই ভয় পায়। বৃষ্টিও থামছেই না।

আজ রাত্তিরে মুম্বইয়ে থেকে যেতে হবে। কোথায় থাকা যায়?

এ শহরে কাকাবাবুদের অনেক চেনা মানুষ আছে। তাদের কারও বাড়িতে থাকতে চাইলে সবাই খুশি হবে। কিন্তু আগে থেকে কিছু বলা নেই, কওয়া নেই, হঠাৎ এই দুর্যোগের মধ্যে কারও বাড়িতে যাওয়া যায়? প্রথমেই মনে পড়ে মঞ্জু আর অমলের কথা। ওরা অনেকবার নেমন্তন্ন করেছে। কিন্তু ওদের বাড়ি অনেক দূরে। এত বৃষ্টির মধ্যে যাওয়াও তো সম্ভব নয়।

ইচ্ছে করলে এই এয়ারপোর্টেই থেকে যাওয়া যায়। অনেক লোক এর মধ্যেই নানান জায়গায় বসে পড়েছে। কাকাবাবুও এক কোণের দিকে পেয়ে গেলেন একটা চেয়ার। অনেক লোক কথা বলছে একসঙ্গে, বাচ্চারা কাঁদছে। এত ভিড়ের মধ্যে সেই মহিলা আর তাঁর মেয়েকে দেখা গেল না। এর মধ্যে দু'-একজনকে বলতে শোনা গেল, সব রেস্টুরেন্টের খাবার ফুরিয়ে গিয়েছে, বাইরেও যাওয়া যাচ্ছে না।

তার মানে, সারারাত এই চেয়ারে বসে কাটিয়ে দিলেও খাবার জুটবে না কিছু। কাকাবাবু মন থেকে এসব চিন্তা মুছে দিয়ে মহাভারত বইখানা খুললেন। পড়তে পড়তে তিনি চলে গেলেন সেই তখনকার আমলে। পাশা খেলায় সর্বস্ব হারিয়ে পাণ্ডবরা বনে বনে ঘুরছে, তিনিও মনে মনে ঘুরতে লাগলেন তাঁদের সঙ্গে। তাঁর আর খিদেটিদের কথা মনেই রইল না।

বৃষ্টি থামল ভোররাত্রে।

কাকাবাবু নিজের সুটকেসটা টানতে টানতে বাইরে বেরিয়ে এসে পেয়ে গেলেন একটা ট্যাক্সি। অনেক রাস্তায় জল জমে আছে, তারই মধ্যে দিয়ে ঘুরে ঘুরে কোনওরকমে পৌঁছে গেলেন অন্য এয়ারপোর্টে। এখানেও একই রকম ভিড়। এত ভোরেও অনেকেই জেগে আছে।

ভিতরে ঢুকে কাকাবাবু খবর নিলেন। তাঁর প্লেন ছাড়বে দুপুর আড়াইটের

সময়। আগের দিন অত দুর্যোগের মধ্যে বিদেশের প্লেনটা মুম্বইয়ে নামতেই পারেনি, চলে গিয়েছে করাচিতে।

তার মানে এখনও অনেকটা সময় কাটাতে হবে! এই ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টের কাছেই কয়েকটা হোটেল আছে। হেঁটেই যাওয়া যায়। কাকাবাবু ঠিক করলেন, কোনও একটা হোটেলেই কয়েক ঘণ্টা বিশ্রাম নিতে হবে।

চাকা লাগানো সুটকেসটা টানতে টানতে তিনি হাঁটতে লাগলেন। দু'বগলে ক্রাচ থাকলে তার সঙ্গে সুটকেস টানতে বেশ অসুবিধে হয়। সন্তু সঙ্গে থাকলে সে-ই সাহায্য করে। এবার সন্তুকে সঙ্গে আনা হয়নি।

প্রথম হোটেলটায় একটাও ঘর খালি নেই। পাশের হোটেলটাতেও সেই একই অবস্থা। তবে, ঠিক তখনই একজোড়া স্বামী-স্ত্রী নেমে এলেন চেক আউট করার জন্য। কাউন্টারের ক্লার্কটি বলল, "স্যার, আপনি যদি আধঘণ্টা অপেক্ষা করেন, তা হলে আপনাকে ওই ঘরটা দিতে পারি। পরিষ্কার করার জন্য একটু সময় লাগবে।"

কাকাবাবু তাতেই রাজি হয়ে গেলেন। ঘুমে তাঁর চোখ ঢুলে আসছে। বসলেন গিয়ে লবিতে।

খানিক পরে পাঁচতলার উপরে ঘরটায় ঢুকে কাকাবাবু স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন। বিছানায় ধবধবে সাদা চাদর পাতা, সেই বিছানাটা তাঁকে টানছে।

এখন মোটে পৌনে ছ'টা বাজে। ঘণ্টা দু'-তিন ঘুমিয়ে নেওয়া যেতেই পারে। জুতোটুতো খুলে কাকাবাবু ধপাস করে পড়ে গেলেন বিছানায়।

ঘুম ভাঙল ন'টার সময়।

মুখটুখ ধোওয়ার পর তিনি ব্রেকফাস্টের অর্ডার দিলেন। কাল দুপুর থেকে কিছু খাওয়া হয়নি। কাকাবাবু চাইলেন ফ্রুট জুস, দুটো ক্রোয়াসঁ, অমলেট আর চা।

দরজার তলা দিয়ে খবরের কাগজ দিয়ে গিয়েছে। খাবার আসবার আগে কাকাবাবু পড়তে লাগলেন কাগজ। কালকের দারুণ ঝড়-বৃষ্টিতে মুম্বই শহরের অনেক ক্ষতি হয়েছে। ভেঙে পড়েছে তিনখানা বাড়ি, আর অনেক গাছ, অনেক দোকানের সাইনবোর্ড আর হোর্ডিং লন্ডভন্ড হয়ে গিয়েছে, বাজ পড়েছে দু'জনের মাথায়। এরই মধ্যে আগুন লেগে গিয়েছিল টিভি স্টেশনে।

কলকাতার কোনও খবরই নেই। তার মানে কলকাতায় কোনও গন্ডগোল হয়নি, ঝড়-বৃষ্টিও হয়নি।

খাবার শেষ করে চায়ে চুমুক দেওয়ার পর কাকাবাবু ফোন করলেন কলকাতায়।

সন্তুই ফোন ধরল।

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "কী রে, এখনও বেরোসনি?"

সন্তু বলল, "এই তো তৈরি হচ্ছি, আর পাঁচমিনিটের মধ্যেই বেরোব। তুমি পৌঁছে গিয়েছ আফ্রিকায়?"

কাকাবাবু বললেন, "না রে, এখনও মুম্বই শহরই ছেড়ে যেতে পারলাম না।"

সন্তু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, "সে কী, কেন?"

কাকাবাবু বললেন, "কাল এমন ঝড়-বৃষ্টি যে, আমাদের প্লেনটা আর-একটু হলেই ডিগবাজি খেয়ে পড়ে যেত। কলকাতায় কীরকম গরম?"

সন্তু বলল, "খুব গরম। কাল ছিল থার্টি নাইন ডিগ্রি।"

কাকাবাবু বললেন, "আর এখানে যখন ভোরবেলা বেরিয়েছি, তখন রীতিমতো শীত শীত করছিল।"

সন্তু বলল, "কাকাবাবু, আমার পরীক্ষা হয়ে গেলে আমি যাব না? আমি নিজেই চলে যেতে পারব। বাবা টিকিটের দাম দিয়ে দেবেন।"

কাকাবাবু বললেন, "টিকিটের দাম থাকলেই তো হল না। ভিসা নিতে হবে, ইয়েলো ফিভারের ইঞ্জেকশন, অনেক ঝামেলা। দাঁড়া, আমি তো আগে যাই, তারপর অবস্থা বুঝে যদি দরকার হয়, তোকে জানাব। আর দেরি করিস না, বেরিয়ে পড়।"

স্নানটান করে নিয়ে কাকাবাবু আরও কিছুক্ষণ কাগজ পড়লেন, তারপর বেরিয়ে পড়লেন বারোটার আগেই।

এয়ারপোর্টের অবস্থা এখন অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। বিমান ছাড়ছে একটার পর-একটা। কাকাবাবু নিজের কাউন্টারে গিয়ে মালপত্র জমা দিয়ে নিশ্চিন্ত হলেন। এখন শুধু কাঁধে ছোট্ট একটা ব্যাগ।

এবার তিনি ফোন বুথে গিয়ে একটা ফোন করার চেষ্টা করলেন আফ্রিকার নাইরোবি শহরে। কিছুতেই কানেকশন পাওয়া যাচ্ছে না। বারবার শোনা গেল, লাইন আউট অফ অর্ডার। কাকাবাবু এখনও মোবাইল ফোন ব্যবহার করেন না। এখন মনে হচ্ছে, একটা ওরকম ফোন থাকলে ভাল হত।

এবারেও কাকাবাবু জানলার ধারে একটা সিট পেয়েছেন। তবে একেবারে পিছনের দিকে। আজ আকাশ পরিষ্কার। এখন আফ্রিকার আকাশে ঝড়-বৃষ্টি না হলেই হয়।

কাকাবাবুর মনের মধ্যে শুধু একটা চিন্তা খচখচ করছে। পৌঁছোবার কথা ছিল গতকাল, তা হল না। মি. লোহিয়াকে খবরও দেওয়া গেল না। এয়ারপোর্টে কেউ নিতে আসবে না তাঁকে। আগেরবার অমল আর মঞ্জু খবর পেয়ে চলে এসেছিল, এখন তারা আফ্রিকা থেকে ফিরে এসে মুম্বইয়ে থাকে। সেবার কাকাবাবুর থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল হিলটন হোটেলে। এবার মি. লোহিয়া জানিয়েছিলেন যে, তিনি একটা নতুন বাড়ি কিনেছেন, কাকাবাবু সেখানেই থাকতে পারবেন। কাকাবাবু অবশ্য কারও বাড়িতে থাকতে অস্বস্তি বোধ করেন। তিনি চিঠির উত্তরে জানিয়েছিলেন যে, প্রথমে তিনি কোনও হোটেলেই উঠতে চান, হিলটন হোটেলের নামও জানিয়েছিলেন। সেখানে বুকিং আছে কি না কে জানে?

যাই হোক, দেখা যাক! পৌঁছোবার পর কিছু একটা ব্যবস্থা হয়েই যাবে।

একটু পর একজন লোক টয়লেটের দিকে যেতে যেতে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে কাকাবাবুর দিকে তাকিয়ে ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করল, "আপনি রাজা রায়চৌধুরী?"

কাকাবাবু মাথা নাড়লেন।

এবার লোকটি বাংলায় বলল, "আপনাকে তো আমি ফোটোয় দেখেছি। আপনি স্যার কোথায় যাচ্ছেন?"

কাকাবাবু বললেন, "নাইরোবি।"

লোকটি বেশ লম্বা, মাঝারি বয়স, মাথাভরতি কালো চুল আর থুতনিতে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি। পুরোদস্তুর সুট-টাই পরা।

সে আবার জিজ্ঞেস করল, "নাইরোবিতে আপনি কোনও কাজে যাচ্ছেন, না বেড়াতে?"

কাকাবাবু উত্তর দিলেন, "বেড়াতে।"

লোকটি বলল, "প্রত্যেকবার তো আপনার সঙ্গে সন্তু নামের ছেলেটি থাকে, এবার সে নেই? একা যাচ্ছেন?"

কাকাবাবু বললেন, "এবার সন্তু আসতে পারেনি, তার অসুবিধে আছে।"

লোকটি বলল, "আমার নাম অরুণকান্তি বিশ্বাস। আমি তো নাইরোবিতে থাকি। আপনাকে একদিন আমার বাড়িতে আসতে হবে কিন্তু!"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি নাইরোবিতে কী করেন?"

লোকটি বলল, "আমি চাকরি করি। একটা কাগজ কোম্পানির ম্যানেজার।

মাঝে মাঝে ইন্ডিয়া যেতে হয়। এই নিন আমার কার্ড।”

কার্ড দিয়ে তিনি টয়লেটে চলে গেলেন।

একটু পরে ফেরার সময় অরুণকান্তি আবার থেমে বললেন, “এয়ারপোর্টে আপনাকে কেউ নিতে আসবে? না হলে, আমার জন্য গাড়ি থাকবে, আপনাকে নিয়ে যেতে পারি।”

কাকাবাবু বললেন, “একজনের আসবার কথা ছিল, কিন্তু কালকের ফ্লাইট মিস করেছি। আপনার সঙ্গে আলাপ হল, ভালই হল।”

লোকটি চলে গেল নিজের জায়গায়।

কাকাবাবুর পাশে বসে আছেন দু’জন আফ্রিকান। কুড়ি-বাইশ বছর বয়স, দু’জনেই সাহেবি পোশাক পরা। এতক্ষণ তারা নিজেদের মধ্যে ফিসফিস করে কথা বলছিল। এবার তাদের একজন কাকাবাবুর দিকে ফিরে বলল, “এক্সকিউজ় মি, আমি কি আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি?”

কাকাবাবু বললেন, “অবশ্যই।”

লোকটি বলল, “আপনারা দু’জনে যে ভাষায় কথা বললেন, সেটা কী ভাষা?”

কাকাবাবু বললেন, “বাংলা। আপনারা এই ভাষার নাম শুনেছেন?”

লোকটি মাথা নেড়ে বলল, “না, আমরা সোমালিয়ার লোক। সেখানে এ ভাষা শুনিনি।”

কাকাবাবু বললেন, “বাঙালিরা পৃথিবীর সব দেশেই আছে। সোমালিয়াতেও আছে নিশ্চয়ই। হয়তো তাদের সংখ্যা কম। আপনারা ইন্ডিয়ার কোথায় কোথায় ঘুরেছেন?”

সে বলল, “আমরা ইন্ডিয়ায় থাকিনি। আমরা দু’জনেই ফিলিপিন্সে পড়াশুনো করি। মুম্বইয়ে এসেছি এই ফ্লাইট ধরেই। ইন্ডিয়ার অনেক লোকই কালো লোকদের খুব অপছন্দ করে, তাই না?”

কাকাবাবু হেসে বললেন, “আমিও তো কালো। সাহেবদের চোখে সব ইন্ডিয়ানই কালো। আমাদের দেশে কিছু লোক আছে, যাদের গায়ের রং একটু পাতলা, আমরা বলি ফরসা। কিন্তু সেই ফরসা রংও সাহেবদের মতন নয়। যাই হোক, সেই ফরসা আর আমার মতন কালো লোকের তো কোনও তফাত নেই আমাদের দেশে। শুধু বিয়ের সময় কিছু লোক ফরসা মেয়ে খোঁজে।”

অন্য ছেলেটি এবার জিজ্ঞেস করল, “কেন, বিয়ের সময় ফরসা মেয়ে খোঁজে কেন?”

কাকাবাবু বললেন, "তারা মনে করে, ফরসা মেয়ে বিয়ে করলে ছেলে-মেয়েরাও ফরসা হবে। তা কিন্তু সব সময় হয় না। আমার মা খুব ফরসা ছিলেন, অথচ আমার গায়ের রং আমার বাবার মতন কালো!"

ছেলেটি খানিকটা পশ্চিমের সুরে বলল, "তা আবার হয় নাকি? ফরসা মেয়ের কালো ছেলে?"

কাকাবাবু বললেন, "হবে না কেন, অনেক হয়। আর-একটা ব্যাপার, আমাদের দেশে মেয়েদের রং ফরসা হলে তাদের সুন্দরী বলে, কিন্তু ছেলেরা বেশি ফরসা হলে তাদের লোকে খ্যাপায় অনেক সময়। স্কুলে আমাদের সঙ্গে একটি ছেলে পড়ত, সে খুব ফরসা। আমরা তাকে 'রাঙামুলো, রাঙামুলো' বলে খ্যাপাতুম, আর সে খুব রেগে যেত।"

ছেলেটি তবু ঠিক বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করল, "তোমাদের দেশে কিছু লোক কালো, কিছু লোক ফরসা হয় কেন?"

কাকাবাবু বললেন, "তার কারণ, বহু জাতের মানুষ তো নানা দেশ থেকে এখানে এসে তারপর থেকে গিয়েছে। তারা কেউ ফরসা, কেউ কালো, কেউ বাদামি। সবাই মিলেমিশে এক হয়ে গিয়েছে। তাই কেউ খুব কালো, কেউ কম কালো, কেউ একটু ফরসা, কেউ বেশি ফরসা, এই সবরকমই আছে। পৃথিবীর আর কোনও দেশে একটা জাতির মধ্যে এতরকম চামড়ার রঙের মানুষ দেখা যায় না। সেই জন্যই তো আমাদের কবি রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, হেথায় আর্য, হেথা অনার্য!"

তাঁকে হঠাৎ রূঢ়ভাবে থামিয়ে দিয়ে অন্য ছেলেটি বলল, "এনাফ! নাউ স্টপ টকিং। কিপ কোয়ায়েট!"

কাকাবাবু বেশ অবাক হলেন। এ কী ব্যাপার! বেশ গল্প করছিল, হঠাৎ অভদ্রের মতন কেউ 'স্টপ টকিং' বলে নাকি? তাও একজন বয়স্ক লোককে? ওরা নিজেরাই তো কথা শুরু করেছিল।

ওরা দু'জনেই ঘনঘন ঘড়ি দেখতে লাগল। কাকাবাবু আবার বই পড়ায় মন দিলেন। এখনও অন্তত ঘণ্টাদেড়েক দেরি আছে।

বেশ কিছুক্ষণ পর একটা ঘোষণা শুরু হল। সেটা একটু শুনেই কাকাবাবু দারুণ চমকে উঠলেন।

ক্যাপটেন বলছেন, "আপনারা যে-যার সিটে বসে থাকুন। প্যানিক করবেন না। আমি এই বিমানের গতিপথ বদলাতে বাধ্য হচ্ছি। আমার ঘাড়ের কাছে একজন রিভলভার ধরে আছে। তার নির্দেশ মতন আমি বিমানটিকে

নাইরোবির বদলে কাম্‌পালায় নামাব। এরা বলছে, আপনারা যদি শান্ত হয়ে হয়ে বসে থাকেন, তা হলে কারও কোনও ক্ষতি করা হবে না।”

কাকাবাবুর পাশ থেকে ছেলে দুটি তড়াক করে উঠে গিয়ে একটু দূরে দূরে দাঁড়াল। এর মধ্যে তারা মুখে কালো কাপড়ের মুখোশ পরে ফেলেছে। কোমর থেকে বার করল দুটো লাল রঙের দড়ি। সেই দড়ি তারা চাবুকের মতন হাওয়ায় শপাং শপাং শব্দ করতে লাগল।

হাইজ্যাকিং!

কাকাবাবু মনে মনে বললেন, ‘যাঃ! আবার দেরি! আজও বোধহয় নাইরোবি পৌঁছোনো যাবে না।’

তাঁর পাশে বসা ছেলে দুটো একবার একটু অভদ্র ব্যবহার করলেও এমনিতে তো নিরীহই মনে হয়েছিল। অন্য কোনও অস্ত্রশস্ত্র নেই, শুধু দু’ টুকরো দড়ি দিয়ে ভয় দেখাবে? ওই দড়ি দিয়ে মারলে বেশ লাগবে ঠিকই, কিন্তু দু’-তিনজন মিলে তো কেড়ে নেওয়াও যায়!

এবার সামনের বাথরুম থেকে আর-একজন কালো মানুষ বেরিয়ে এল, তারও মুখে মুখোশ আর হাতে একটা এ কে ফর্টি সেভেন বন্দুক।

সে সেটা তুলে কর্কশভাবে বলল, “কেউ জায়গা ছেড়ে উঠবে না। কেউ একটাও কথা বলবে না।”

দু’-তিনজন মহিলা ভয়ের শব্দ করে উঠল। কেঁদে উঠল একটা শিশু।

লোকটি ধমক দিয়ে বলল, “বাচ্চাটার কান্না বন্ধ করো।”

বাচ্চার কান্না কী করে বন্ধ করা যায়? বোধহয় মা তার মুখে হাত চাপা দিলেন। তবু একটু একটু শোনা যেতে লাগল তার কান্না।

কাকাবাবু ভাবলেন, এরা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে প্লেনে উঠল কী করে? আমেরিকায় একসঙ্গে চারটে প্লেন হাইজ্যাকিং হওয়ার পর (যাকে সবাই বলে নাইন/ইলেভেনের ঘটনা) সারা পৃথিবীতেই নিরাপত্তার খুব কড়াকড়ি। সুটকেস, ব্যাগ এক্স-রে হয়, সারাগায়ে হাত বুলিয়ে দেখে। কোনও অস্ত্র লুকিয়ে আনবার তো উপায়ই নেই।

তবু তো একজনের হাতে একটা মারাত্মক অস্ত্র দেখা যাচ্ছে। আর-একজন পাইলটের ঘাড়ে রিভলবার চেপে ধরে আছে।

এক হতে পারে, এয়ারপোর্টে যেসব কর্মী আগে থেকে বিমানে উঠে সাফটাফ করে, তাদেরই কাউকে টাকা খাইয়েছে। সে গোপনে অস্ত্র নিয়ে কোথাও লুকিয়ে রেখে গিয়েছে। এর ফলে দেশের যে কত ক্ষতি হতে পারে,

কত মানুষের প্রাণ যেতে পারে, তা সে ভাবল না? অনেকেই দেশের কথা কিংবা অন্য মানুষের কথা ভাবে না। টাকার লোভে সব কিছু করতে পারে। নিশ্চয়ই বহু টাকা দিয়েছে।

কাকাবাবু ঠিক ভয় পাননি। এর আগে তিনি অনেকবার সাংঘাতিক বিপদে পড়েছেন, তাই ভয়কে জয় করে ফেলেছেন। কিন্তু এর পরে কী হবে, সেই কৌতূহলেই তিনি ছটফট করছেন। এই হাইজ্যাকাররা অল্পবয়সি ছেলে, এরা নিজের জীবনের পরোয়া করে না। এদের দাবি না মিটলে এরা পুরো প্লেনটাই উড়িয়ে দিতে পারে। তাতে আর সবাই মরবে, নিজেরাও মরবে!

কাকাবাবু আপনমনে একবার মাথা নাড়লেন। নাঃ, এতবার এত বিপদ থেকেও তিনি বেঁচে গিয়েছেন। এখন এই আকাশ-দস্যুদের জন্য তাঁকে প্রাণ দিতে হবে? এটা ঠিক যেন বিশ্বাস হয় না।

সবাই চুপচাপ, হঠাৎ একজন বয়স্ক যাত্রী উঠে দাঁড়াল।

সঙ্গে সঙ্গে একজন হাইজ্যাকার ধমক দিয়ে বলল, "সিট ডাউন! সিট ডাউন!"

লোকটি বলল, "আমি একবার টয়লেটে যাব!"

হাইজ্যাকারটি বলল, "না, এখন যাওয়া চলবে না। বোসো! বোসো!"

লোকটি কাঁদোকাঁদো হয়ে বলল, "আমার খুব বাথরুম পেয়েছে। এক্ষুনি একবার যেতেই হবে!"

লোকটির মুখ দেখে অন্য সময় হাসি পেয়ে যেত। কিন্তু এখন লোকটির উপর মায়াই হচ্ছে।

হাইজ্যাকারটি ভেংচি কেটে বলল, "খুব বাথরুম পেয়েছে? পাক! এখন কিছুতেই যাওয়া যাবে না।"

লোকটি বেপরোয়া হয়ে তবু দু'-এক পা এগিয়ে গেল।

হাইজ্যাকারটি এগিয়ে গিয়ে তার চুলের মুঠি ধরে বলল, "মরতে চাস? না হলে চুপ করে বোস!"

সে হাতের দড়িটি দিয়ে লোকটির পিঠে ভীষণ জোরে একটা চাবুক কষাল।

লোকটি এবার বসে পড়ল নিজের সিটে। নিচু করল মাথাটা। কোনও কোনও বুড়ো মানুষের একটা রোগ থাকে। টয়লেট পেলে বেশিক্ষণ সামলাতে পারে না। ওকে টয়লেটে যেতে দিলে কী এমন ক্ষতি হত?

এখানে প্রতিবাদ করে লাভ নেই। উলটে অপমান সহ্য করতে হবে?

সবাই একেবারে চুপচাপ। শুধু সেই বাচ্চাটার মুখ বন্ধ করে কান্না শোনা যাচ্ছে।

সময় যেন কাটতেই চায় না। প্লেনটা যেন যাচ্ছে তো যাচ্ছেই।

এর মধ্যে একজন হাইজ্যাকার ফস করে একটা সিগারেট ধরিয়ে ফেলল।

আজকাল সব প্লেনে ধূমপান খুব কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। বাথরুমে গিয়ে কেউ সিগারেট ধরালেও ধরা পড়ে যায়। হাইজ্যাকাররা কোনও নিয়মকানুন মানছে না।

কাকাবাবু একবার ভাবলেন, ওকে একবার চেঁচিয়ে বললে কেমন হয় যে, 'অ্যাই, তুমি প্লেনে সিগারেট খাচ্ছ। তোমার পাঁচশো ডলার ফাইন হবে।'

কাকাবাবু অতি কষ্টে নিজেকে সংযত করলেন। এখন রসিকতার সময় নয়, এরা রসিকতা বুঝবেও না। হয়তো দুম করে গুলি চালিয়ে দেবে।

এরকম অবস্থায় বই পড়তেও মন বসে না।

কাকাবাবু মনটাকে অন্য দিকে ফেরাবার জন্য মনে মনে কবিতা বলতে চাইলেন। কোন কবিতা? রবীন্দ্রনাথের কবিতা কাকাবাবুর খুবই ভাল লাগে। কিন্তু তাঁর সবচেয়ে প্রিয় সুকুমার রায়ের লেখা।

মানুষের মন অতি বিচিত্র। কখন যে কোনটা মনে পড়ে তার কোনও ঠিক-ঠিকানা নেই।

কোনও কবিতার বদলে তাঁর মনে পড়ল, সুকুমার রায়েরই লেখা একটা গান। 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল' নাটকের। কাকাবাবু নিজে স্কুলে পড়ার সময় এই নাটকে অভিনয় করেছিলেন। তাই অনেক গান তাঁর এখনও মনে আছে। একটা গান এইরকম:

'অবাক কল্লে রাবণ বুড়ো—
যষ্ঠির বাড়ি সুগ্রীবে মারি
কল্লে যে তার মাথা গুঁড়ো
অবাক কল্লে রাবণ বুড়ো।
(আহা) অতি মহাতেজা সুগ্রীব রাজা
অঙ্গদেরই চাচা খুড়ো,
অবাক কল্লে রাবণ বুড়ো!'

মনে মনে এইটুকু গাইতেই কাকাবাবুর হাসি পেয়ে গেল, 'যষ্ঠি' মানে তো লাঠি। রাবণ কি হাতে লাঠি নিয়ে যুদ্ধ করতে এসেছিলেন? রাবণের তো

অনেক রকম অস্ত্রশস্ত্র থাকার কথা? ছেলেবেলায় থিয়েটার করার সময় এ কথাটা তো মনে আসেনি!

আর-একটা গান:

> 'শোনরে ওরে হনুমান হওরে ব্যাটা সাবধান
> আগে হতে পষ্ট বলে রাখি।
> তুই ব্যাটা জানোয়ার নিষ্কর্মার অবতার
> কাজে কর্মে দিস বড় ফাঁকি!'

কাকাবাবু নিজে জাম্বুবানের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। জাম্বুবানের কি কোনও গান ছিল? না বোধহয়! আর-একটা গান ছিল বিভীষণের...। এইসব ভাবতে ভাবতেই কিছুটা সময় কেটে গেল।

এবার ক্যাপ্টেনের ঘোষণা শোনা গেল, "সবাই সিটবেল্ট বেঁধে নিন। আমরা কাম্‌পালা বিমান বন্দরে অবতরণ করছি। কেউ ব্যস্ত হবেন না, আগে থেকে উঠে দাঁড়াবেন না...।"

॥ ২ ॥

কাম্‌পালা বিমানবন্দরটি উগান্ডা রাজ্যে। ওর পাশেই কেনিয়া। এই উগান্ডাতেই আছে বিশ্ববিখ্যাত জলপ্রপাত ভিক্টোরিয়া। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস 'চাঁদের পাহাড়' এখানকারই একটা পাহাড় নিয়ে লেখা। বিভূতিভূষণ অবশ্য কখনও আফ্রিকায় আসেননি। বই পড়ে লিখেছেন, কিন্তু কী চমৎকার লিখেছেন!

কাকাবাবু যখন আগেরবার কেনিয়ায় এসেছিলেন, তখন এখানকার চাঁদের পাহাড় দেখে যাওয়ারও খুব ইচ্ছে ছিল। কিন্তু তখন এখানে মারামারি, কাটাকাটি চলছিল খুব, তাই আসা সম্ভব ছিল না। তারপর তো কেনিয়াতেই এমন কাণ্ড হল...!

একটা ঝাঁকুনি দিয়ে প্লেনটা মাটি স্পর্শ করার পর কাকাবাবু খানিকটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন। যাক, তবু তো আকাশে থাকতে-থাকতেই কোনও দুর্ঘটনা হয়নি। যতই মানুষ প্লেনে চেপে এদেশে-ওদেশে যাক, তবু মাটির সঙ্গেই মানুষের আসল সম্পর্ক।

বন্দুকধারী হাইজ্যাকারটি হুকুম করল, "কিপ কোয়ায়েট। সিট টাইট। যে-যার জায়গায় বসে থাকো।"

এক ভদ্রমহিলা উঠে দাঁড়িয়ে অনুনয়ের সুরে বললেন, "এখন আমার বাচ্চাকে কি একবার টয়লেটে নিয়ে যেতে পারি?"

হাইজ্যাকারটি একটু চিন্তা করে বলল, "ঠিক আছে, যাও!"

তারপর সে বুড়ো ভদ্রলোকটিকে উদ্দেশ করে বলল, "হেই, তুমিও এবার যেতে পারো।"

লোকটি উঠল না। দু'হাতে মাথা চেপে, মুখ নিচু করে বসে রইল। তার পিঠটা কেঁপে কেঁপে উঠছে। বোধহয় কাঁদছে।

কাকাবাবু ভাবলেন, নিশ্চয়ই ভদ্রলোকটি আর চেপে রাখতে না পেরে প্যান্টেই টয়লেট করে ফেলেছে। বাচ্চারা যেমন করে, তেমন বুড়ো মানুষদেরও এরকম হতে পারে। বাচ্চারা লজ্জা পায় না, বুড়ো মানুষদের তো লজ্জা হবেই। সেই লজ্জাতেই কাঁদছে। ইস!

আর-একজন লোক হাত তুলে বলল, "একটু খাবার জল পেতে পারি?"

হাইজ্যাকারটি বলল, "নাঃ!"

লোকটি বলল, "খুব তেষ্টা পেয়েছে!"

এদের একজন কাছে গিয়ে সেই লোকটির মুখে একবার চাবুকের মতো দড়ি দিয়ে মারল।

তারপর চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, "আমাদের দেশে অনেক লোক সারাদিন জল না খেয়েও থাকতে পারে। সাত মাইল হেঁটে গিয়ে জল আনতে হয়।"

এই প্লেনে দুশোর বেশি যাত্রী। আর হাইজ্যাকাররা মাত্র চারজন। তবু ওদের কথা না শুনে উপায় নেই। ওদের কাছে আছে মারাত্মক অস্ত্র। ওরা কাউকেই দয়ামায়া করে না। যে-কোনও সময়, যাকে-তাকে মেরে ফেলতে পারে।

কাকাবাবু ঘড়ি দেখলেন। কতক্ষণ ঠায় বসে থাকতে হবে তার ঠিক নেই। এই হাইজ্যাকারদের নিশ্চয়ই কিছু দাবি আছে, তাই নিয়ে এখানকার সরকারের সঙ্গে দরাদরি করবে। কয়েক ঘণ্টা লাগতে পারে, কিংবা একদিন-দু'দিনও কেটে যেতে পারে। তার মধ্যে খাবার পাওয়া যাবে না, জলও পাওয়া যাবে না। অন্যরা সহ্য করতে পারলেও কয়েকটা বাচ্চা আছে। তারা কী করে সহ্য করবে?

খবরের কাগজে কাকাবাবু অনেক হাইজ্যাকিং-এর ঘটনা পড়েছেন। কিন্তু নিজের কখনও এমন অভিজ্ঞতা হয়নি।

তিনি বুঝতে পারছেন, এখানে প্রতিবাদ জানাবার উপায় নেই। মুখ বুজেই থাকতে হবে। দেখা যাক, এর পর কী হয়!

কাকাবাবু আবার মহাভারত খুললেন। খানিক পর খেয়াল হল, তিনি বইয়ের দিকে তাকিয়েই আছেন শুধু, পড়ছেন না। এই সময় কি বইয়ে মন বসানো যায়?

জানলা দিয়ে দেখলেন, মারাত্মক সব অস্ত্র নিয়ে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে সৈন্যরা। প্লেনটাকে ঘিরে ফেলেছে। ইচ্ছে করলে ওরা প্লেনটাকেই ধ্বংস করে দিতে পারে, কিন্তু তাতে এত যাত্রীরও প্রাণ যাবে। এই যাত্রীদের প্রাণ নিয়েই দরাদরি চলছে।

এই হাইজ্যাকাররা যে কী চায়, সেটাই তো জানা যাচ্ছে না। সাধারণত ওরা ওদের দলের কিছু বন্দির মুক্তি চায়। তারপর প্লেনটা নিয়ে উড়ে যেতে চায় অন্য দেশে।

কেটে গেল প্রায় একঘণ্টা। কেউ ফিসফিস করেও কথা বলছে না।

আবার একটি লোক উঠে দাঁড়াল। লোকটি বেশ লম্বা আছে, সুন্দর চেহারা।

মাথা নাড়তে নাড়তে সে পাগলের মতো বলতে লাগল, "আমি আর পারছি না। সহ্য করতে পারছি না। আমাকে নামতেই হবে। নামতে দাও!"

বন্দুকধারী ধমক দিয়ে বলল, "সিট ডাউন! সিট ডাউন!"

লোকটি তবু বলল, "না, বসব না। বসে থাকতে পারছি না। আই মাস্ট গো!"

বন্দুকধারী এবারে চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, "তুমি যাবেই। বেশ, তোমাকে যাওয়াচ্ছি।"

কাছে এগিয়ে এসে সে লোকটির বুকে বন্দুকটি ঠেকিয়ে বলল, "একটা গুলি! তাতেই তোমার প্রাণপাখিটা বেরিয়ে যাবে। তারপর উড়ে উড়ে বাইরে চলে যেয়ো!"

লোকটি বিকৃত গলায় চেঁচিয়ে বলল, "তাই করো। আমাকে গুলি করো। তবু আমি বসে থাকব না!"

বোঝাই যাচ্ছে, দুশ্চিন্তায় লোকটির মাথার গন্ডগোল হয়ে গিয়েছে।

অন্য একজন হাইজ্যাকার ওর পিছনে এসে নিজের দড়িটা দিয়ে চট করে ওই লোকটির গলায় ফাঁস পরিয়ে দিল। তারপর প্যাঁচাতে লাগল দড়িটা।

লোকটি যন্ত্রণায় আর্তনাদ করতে লাগল।

হাইজ্যাকারটি দড়ির প্যাঁচ যত শক্ত করতে লাগল, ততই লোকটির চিৎকারও বাড়তে লাগল। তারপর একসময় ধপ করে পড়ে গেল মেঝেয়।

মরে গেল? কিংবা অজ্ঞানও হতে পারে।

এই দৃশ্য দেখে রাগে কাকাবাবুর শরীর জ্বলছে। তিনি উত্তেজিতভাবে উঠে দাঁড়াতে যাচ্ছিলেন, অতি কষ্টে দমন করলেন নিজেকে। প্রতিবাদ করতে গেলে তাঁকেও ওরকমভাবে মারবে।

তিনজন এয়ার হোস্টেস দেওয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে ছবির মতো। বোধহয় তাদের চোখের পাতাও পড়ছে না একবারও।

একটু পর ককপিট থেকে বেরিয়ে এলেন পাইলট আর কো-পাইলট। তাঁদের পিছনে রিভলবার উঁচিয়ে একজন হাইজ্যাকার।

এবার প্লেনের দরজা খুলে গেল, পাইলট দু'জনকে নামিয়ে দেওয়া হল সিঁড়ি দিয়ে। দরজাটা খোলাই রইল।

কী ব্যাপার হল, বোঝাই যাচ্ছে না। বাচ্চা দুটো কেঁদেই চলেছে, নিশ্চয়ই ওদের খিদে পেয়েছে। আজকাল প্লেনে জলের বোতল নিয়ে ওঠা যায় না। এখানেও জল দেওয়া হচ্ছে না। মানুষ এত নিষ্ঠুর হয় কী করে?

দড়ি হাতে হাইজ্যাকার দুটো সিগারেট টেনেই চলেছে। আর যার হাতে এ কে ফর্টি সেভেনের মতো মারাত্মক বন্দুক, সে তার অস্ত্রটা এদিক-ওদিক ঘোরাচ্ছে অনবরত। যেন যে-কোনও মুহূর্তে সে যাকে-তাকে গুলি করে মেরে ফেলতে পারে।

একসময় দড়িধারীদের একজনের মোবাইল ফোন বেজে উঠল। সে কী সব কথা বলল দু'-তিন মিনিট ধরে। তারপর সে ফোনটা নিয়ে গেল অস্ত্রধারীর কানের কাছে। সে-ও একটুক্ষণ শোনার পর বলল, "ওকে, ওকে!"

এবার সে চেঁচিয়ে যাত্রীদের উদ্দেশে বলল, "হিয়ার ইজ অ্যান অ্যানাউন্সমেন্ট। সবাই মন দিয়ে শোনো। এখন আমরা যাত্রীদের মধ্যে থেকে কুড়িজনের মতো ব্যাচকে ছেড়ে দেব। আমরা যাদের বেছে নেব, তারা ছাড়া আর কেউ সিট ছেড়ে উঠবে না। কেউ কোনও কথা বলবে না। যাদের নামিয়ে দেব, তারাও লাইন বেঁধে যাবে, কেউ দৌড়োবে না। একটু এদিক-ওদিক হলেই আমরা গুলি চালাব। ক্লিয়ার?"

এবার সে এলোপাথাড়িভাবে এক-একজনের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলতে লাগল, "ইউ গেট আপ! ইউ! ইউ!"

একজন লোক উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "আমার ওয়াইফ, সে যাবে না?"

অস্ত্রধারী বলল, "শাট আপ! নো ওয়াইফ!"

স্বামী আর স্ত্রীর মধ্যে একজন থাকলে আর-একজন যাবে, তা কি হয় নাকি? কিন্তু এরা যে কোনও কথাই শুনবে না।

কাকাবাবু আশা করলেন, বাচ্চার মা দু'জনকে নিশ্চয়ই এরা ছেড়ে দেবে! কী আশ্চর্য ব্যাপার, সেই মা দু'জনের দিকে অস্ত্রধারী আঙুল দেখাল না, নম্বর গুনতে গুনতে কুড়ি নম্বরে এসে কাকাবাবুর দিকে তাকিয়ে বলল, "অ্যান্ড ইউ! কাম!"

কাকাবাবু উঠে দাঁড়িয়ে খুবই বিনীতভাবে বললেন, "আপনাদের একটা অনুরোধ করতে পারি? আমার বদলে যদি ওই বাচ্চাদের মায়েদের ছেড়ে দেন, খুব ভাল হয়। ওরা কষ্ট পাচ্ছে। আমি আরও অপেক্ষা করতে পারি, আমার কোনও অসুবিধে নেই।"

লোকটি প্রচণ্ড ধমক দিয়ে বলল, "শাট আপ! বলেছি না, কেউ কোনও কথা বলবে না!"

কাকাবাবু তবু দাঁড়িয়ে রইলেন।

দড়ি হাতে যে-দু'জন কাকাবাবুর পাশে বসে ছিল, তাদের মধ্যে একজন এগিয়ে এসে কাকাবাবুর চুলের মুঠি ধরে বলল, "কেন সময় নষ্ট করছিস! বেরিয়ে আয়!"

কাকাবাবুর ক্রাচ দুটো পাশে রাখা ছিল। তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলে ক্রাচ দুটো নেওয়ার চেষ্টা করতেই সে আবার দাঁত খিঁচিয়ে বলল, "নো! ওসব নেওয়া চলবে না। কেউ হ্যান্ডব্যাগও নিতে পারবে না। লাইনে এসে দাঁড়াও!"

কাকাবাবু এগিয়ে যেতে লাগলেন দরজার দিকে।

কয়েকটা রো পরেই অরুণকান্তি বিশ্বাসের সঙ্গে তাঁর চোখাচোখি হল। তাঁর মুখে একটা দারুণ অসহায় ভাব। কাকাবাবু আর বাকি উনিশজন যেন লটারি জিতেছেন। বাকি যাত্রীদের ভাগ্যে যে কী আছে, কে জানে!

কথা বলার উপায় নেই, কাকাবাবুকে সামনের দিকে যেতেই হল।

অস্ত্রধারী আগে নামল, তার পিছনে পিছনে অন্য সবাই। কাকাবাবু সকলের শেষে। তিনি দরজার কাছে এসে দেখলেন, অস্ত্রধারীটি সিঁড়ির মাঝখানে দাঁড়িয়ে থেকে অন্যদের গুনে গুনে নামাচ্ছে।

ক্রাচ ছাড়া কাকাবাবুর সিঁড়ি দিয়ে উঠতে-নামতে খুব অসুবিধে হয়। তিনি একটা পাশ ধরে বাচ্চাদের মতো লাফিয়ে লাফিয়ে নামতে লাগলেন। তাঁর দু'পায়ে দু'রকম জুতো। খারাপ পা-টায় একটা স্পেশ্যাল অর্ডারি জুতো

পরতে হয়, অন্য পায়ে সাধারণ জুতো। কয়েকটা সিঁড়ি নামার পর কাকাবাবুর সেই সাধারণ জুতোটা হঠাৎ খুলে গেল।

সেটা আবার ঠিকমতো পরে নেওয়ার জন্য কাকাবাবু একটু থামলেন।

অমনি সেই অস্ত্রধারীটা কাছে এসে কাকাবাবুর গোঁফটা ধরে কয়েকবার জোরে টানাটানি করে মুখ ভেংচে বলল, "এই বুড়ো, তুই ইচ্ছে করে দেরি করছিস, তাই না? তুই মহাবদমাশ। নাম।"

সে একটা লাথিও কষাল কাকাবাবুর পিছনে।

যাদের গোঁফ থাকে, তাদের গোঁফ ধরে টানা মানে তাদের চূড়ান্ত অপমান করা। এই অস্ত্রধারীটা নিশ্চয়ই তা জানে। সেজন্যই এ কাজটি করে সে হাসতে লাগল।

কাকাবাবু আস্তে আস্তে মুখ ফিরিয়ে তাকালেন সেই লোকটির দিকে। তাঁর এরকম হিংস্র মুখ কেউ কখনও দেখেনি। তাঁর চোখ দুটি যেন বাঘের মতো জ্বলছে।

তিনি প্রচণ্ড জোরে এক ঘুসি মারলেন লোকটির চোখে।

খোঁড়া মানুষের হাতে যে কত শক্তি থাকে তা অনেকেই জানে না। এই অবস্থায় কাকাবাবু যে মারতে পারেন, তা ওই লোকটি ভাবতেও পারেনি।

ওই ঘুসি খেয়ে সে 'আঃ' চিৎকার করে উলটে পড়ে গেল। গড়াতে লাগল সিঁড়ি দিয়ে। চোখের যন্ত্রণায় সে এক হাতে চোখ চাপা দিতেই তার অন্য হাত থেকে ভারী অস্ত্রটা খসে পড়ে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে অন্য দু'জন যাত্রী লাথি মেরে সেই অস্ত্রটা সরিয়ে দিল। যেসব সৈন্য দূরে দাঁড়িয়ে ছিল, তারা ছুটে এল এদিকে। তাদের গুলিতে আহত হয়ে সেই লোকটি কাতরাতে লাগল।

বিমান বন্দরের নানা দিকের ছাদেও পাহারা দিচ্ছে সৈন্যরা। তারা দূরবিন দিয়ে দেখছেও সব কিছু। তক্ষুনি মাইক্রোফোনে ঘোষণা হল, "সবাই শুয়ে পড়ুন, মাটিতে শুয়ে পড়ুন।"

পাইলট দু'জন আগেই শুয়ে পড়েছেন টারমাকে। তাঁদের কাছে রিভলবার নিয়ে যে দাঁড়িয়ে ছিল, সে ঠিক বুঝতে পারল না কী ঘটছে। সে ঘুরে দাঁড়িয়ে গুলি চালাতে শুরু করল। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে সে নিজেই গুলি খেয়ে ছটফট করতে লাগল মাটিতে পড়ে।

বাকি রইল প্লেনের মধ্যে দু'জন, যাদের কাছে দড়ি ছাড়া আর কোনও অস্ত্র নেই। অন্য যাত্রীদের সঙ্গে এবার তাদের ধস্তাধস্তি শুরু হল। সেই দু'জনকে

কাবু করতে বেশিক্ষণ সময় লাগল না। রাগের চোটে অনেকে মিলে তাদের এমন পেটাতে শুরু করল যে, আর কিছুক্ষণ দেরি হলে তারা মরেই যেত। এর মধ্যেই কয়েকজন সৈন্য সিঁড়ি দিয়ে দৌড়ে উঠে গিয়ে সেই দু'জনকে যাত্রীদের হাত থেকে বাঁচিয়ে গ্রেফতার করল।

কাকাবাবু স্থিরভাবে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে রইলেন সিঁড়িতে। তাঁর পাশ দিয়ে হুড়মুড় করে নেমে যাচ্ছে যাত্রীরা। কাকাবাবুর জন্যেই যে তারা মুক্তি পেয়েছে, তা কেউ এখনও জানে না।

সৈন্যরা সবই দেখেছে। দু'জন বড় অফিসার এবার কাকাবাবুর কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, "স্যার, আপনার কোথাও লাগেনি তো? আপনি আজ যে সাহস দেখালেন...।"

কাকাবাবু তক্ষুনি কিছু বলতে পারলেন না। তাঁর শরীর থরথর করে কাঁপছে। লোকটিকে ঘুসি মারার এক মুহূর্ত আগেও তিনি মারার কথা ভাবেননি। তাঁর শরীরের মধ্যে যত রাগ জমা হচ্ছিল, সব যেন হঠাৎ আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণের মতো বেরিয়ে এসেছে।

সেনাবাহিনীর অফিসাররা কাকাবাবুর প্রশংসা করে যাচ্ছেন নানাভাবে, কাকাবাবু তা কিছুই শুনছেন না। একটু পরে তিনি শান্তভাবে বললেন, "আপনারা কেউ দয়া করে প্লেনের ভিতর থেকে আমার ক্রাচটা এনে দেবেন? না হলে আমার হাঁটতে অসুবিধে হয়।"

অরুণকান্তি বিশ্বাস এর মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছেন কাকাবাবুর পাশে। এর মধ্যে একজনকে উপরে পাঠিয়ে দেওয়া হল ক্রাচ দুটো আনার জন্য। অরুণকান্তি সেনাবাহিনীর অফিসারদের দিকে তাকিয়ে উত্তেজিতভাবে বললেন, "ইনি কে জানেন? হি ইজ আ গ্রেট ম্যান। ইন্ডিয়ায় ইনি খুব ফেমাস।"

একজন অফিসার বললেন, "এঁর অসাধারণ সাহস। এঁর জন্যই আজ এত মানুষ বিপদ থেকে মুক্তি পেয়েছে।"

কাকাবাবু বললেন, "আমি এখন কোথাও গিয়ে একটু বসতে চাই। আমার খুব জলতেষ্টা পেয়েছে।"

কাম্‌পালা বিমানবন্দরটি খুব আধুনিক। মস্ত বড় লাউঞ্জ। উদ্ধার পাওয়া যাত্রীদের বসানো হয়েছে সেখানে। কাকাবাবুকে নিয়ে যাওয়া হল আলাদা একটা ঘরে। জল ছাড়াও, শরবত ও নানারকম খাবারদাবার আসতে লাগল।

এর মধ্যে সমস্ত ঘটনাটা জানাজানি হয়ে গিয়েছে। হাইজ্যাকাররা সোমালিয়ার লোক। তাদের কী একটা দল আছে, সেই দলের এগারোজন

সদস্য বন্দি হয়ে আছে। যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়েছে। তাদের মুক্তির দাবিতেই প্লেন হাইজ্যাক করেছিল। তবে হাইজ্যাকার হিসেবে এরা তেমন পাকা নয়। নইলে এত সহজে ব্যাপারটা শেষ হত না। সেই চারজনের কেউ অবশ্য প্রাণে মরেনি। গুরুতর আহত। কড়া পাহারায় তাদের পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে হাসপাতালে।

রাজা রায়চৌধুরী নামে একজন যাত্রীর জন্যই যে এত মানুষের বিপদ থেকে মুক্তি ঘটেছে, তাও জেনে গিয়েছে সবাই। দলে দলে লোক আসছে কাকাবাবুকে কৃতজ্ঞতা জানাতে। কাকাবাবু অত কিছু শুনতে চান না, তিনি বিব্রত বোধ করছেন, তাই একসময় বলে দিলেন দরজা বন্ধ করে দিতে।

তবু একসময় জোর করে সেই দরজা খুলিয়ে ঢুকে এলেন এক মহিলা। তাঁর কোলে একটি শিশু আর পিছনে তাঁর স্বামী। দৌড়ে কাকাবাবুর পায়ের কাছে বসে পড়ে বাংলায় বললেন, "আপনি কাকাবাবু! আপনার কথা কত শুনেছি। আমার দেওর বাপি, সে সন্তুর সঙ্গে এক স্কুলে পড়েছে। সন্তু এসেছে আমাদের কেয়াতলার বাড়িতে। আপনি আমাদের বাঁচালেন। আমার ছেলেটা, একটুও জল দেওয়া যায়নি, তেষ্টায় ওর গলা কাঠ হয়ে গিয়েছিল, হেঁচকি তুলছিল, আর বেশি দেরি হলে...!"

মহিলা এসব কথা বলেই চলেছেন, কাকাবাবু তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, "ছিঃ, ওরকম পায়ের কাছে বসতে নেই। আমার পাশে এসে বোসো। আমি এমন কিছু করিনি। অন্যায় দেখলে সবাই কিছু না-কিছু প্রতিবাদ করে।"

মহিলাটি উঠে পাশের চেয়ারে বসার পরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। কাকাবাবু হাত তুলে বললেন, "শোনো, আমার একটা কথা আগে শোনো। তুমি গান জানো?"

মহিলাটি হকচকিয়ে গিয়ে বললেন, "গান? হঠাৎ একথা জিজ্ঞেস করছেন কেন?"

কাকাবাবু মুচকি হেসে বললেন, "তোমাকে দেখেই মনে হচ্ছে, তুমি একজন গায়িকা। একটা গান শোনাও না! এইসব সময় একটা গান শুনলে মনটা জুড়িয়ে যায়। হাইজ্যাকিং-এর একঘেয়ে কথা আর কত শুনব!"

মহিলাটির স্বামী বললেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, ও খুব ভাল গান জানে। সুচিত্রা মিত্রের ছাত্রী ছিল। আপনি ঠিক ধরেছেন।"

কাকাবাবু বললেন, "শোনাও, একটা রবীন্দ্রসংগীত শোনাও!"

মহিলাটি একটুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, "আমার বুক এখনও

ধড়ফড় করছে। একটা অল্পবয়সি হাইজ্যাকার যখন আপনার চুলের মুঠি ধরল, তখন আমার এমন কষ্ট হয়েছিল। আপনি তো নাইরোবি যাচ্ছেন, ওখানে আমাদের বাড়িতে একদিন আসতেই হবে। তখন আপনাকে গান শোনাব। এখন গলা দিয়ে সুর বেরোবে না।"

ওঁর নাম হেমন্তিকা, স্বামীর নাম বিনায়ক ঘোষ। স্বামীটি কাকাবাবুকে নিজের একটি কার্ড দিলেন।

কাকাবাবু এবার গলা তুলে এখানকার একজন অফিসারকে জিজ্ঞেস করলেন, "আমাদের প্লেনটা আবার কখন যাবে? একটু তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা করুন না!"

॥ ৩ ॥

প্লেনটা আবার আকাশে উড়ল তিনঘণ্টা পরে।

এবার কাকাবাবুর পাশে বসেছেন অরুণকান্তি। তিনি বললেন, "আমি বয়সে আপনার চেয়ে তেমন কিছু ছোট নই। তবু অনেকেই আপনাকে 'কাকাবাবু' বলে, আমিও 'কাকাবাবু' বলে ডাকতে পারি?"

কাকাবাবু হেসে বললেন, "হ্যাঁ, পারেন নিশ্চয়ই। কাকাবাবুটাই এখন আমার ডাকনাম হয়ে গিয়েছে। অনেকে আসল নামই মনে রাখে না।"

অরুণকান্তি বললেন, "তা হলে আপনি আমাকে 'তুমি' বলবেন। যদি কিছু মনে না করেন, আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব?"

কাকাবাবু বললেন, "হ্যাঁ।"

অরুণকান্তি বললেন, "আপনি যে একজন হাইজ্যাকারকে ঘুসি মারলেন, তখন একটুও ভয় করেনি? ওর হাতে অমন মারাত্মক অস্ত্র ছিল, আপনার ঘুসিটা যদি ওর চোখে ঠিকমতো না লাগত, তা হলে তো সঙ্গে সঙ্গে গুলি চালিয়ে আপনাকে মেরে ফেলত। সেকথা একবারও ভাবেননি?"

কাকাবাবু বললেন, "না, সেকথা মনে পড়েনি। তখন এমন রাগ হয়ে গিয়েছিল, সে সময় আর কোনও কিছু মনে পড়ে না। তবে মরতে তো একদিন হবেই, বিছানায় শুয়ে অসুখে ভুগে ভুগে মরার চেয়ে কোনও অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে গিয়ে যদি মরতে হয়, সেটাই ভাল মনে হয় আমার কাছে।"

অরুণকান্তি আরও কিছু বলতে গেলেন, তা আর শোনা গেল না।

প্লেনের সামনের দিকে দশ-বারোজন লোক একসঙ্গে একটা গান গেয়ে উঠল। তারা সবাই আফ্রিকান। সে গানের ভাষা বোঝা যায় না।

প্লেনে সবাই গম্ভীর হয়ে থাকে কিংবা পাশের লোকের সঙ্গে নিচু গলায় কথা বলে। এরকমভাবে কোরাস গান আগে কখনও শোনা যায়নি। আসলে এত বড় একটা বিপদ কেটে গিয়েছে বলে সকলেরই এত ফুর্তি হয়েছে যে, তা আর চেপে রাখতে পারছে না।

গানের সুরটায় বেশ দুলুনি আছে, শুনতে ভাল লাগে।

অরুণকান্তি বললেন, "কাকাবাবু, আপনি গানের কথা কিছু বুঝতে পারছেন?"

কাকাবাবু বললেন, "না। এটা কি সোয়াহিলি ভাষা? আমি বুঝব কী করে?"

অরুণকান্তি বললেন, "আমি একটু একটু বুঝি। আমাকে প্রায়ই কেনিয়ার নানান জায়গায় ঘুরে বেড়াতে হয়, তাই সোয়াহিলি ভাষা খানিকটা শিখতে হয়েছে। ওই যে মাঝে মাঝেই বলছে, 'হাকুনা মাটাটা, হাকুনা মাটাটা', তার মানে হচ্ছে, আর কোনও সমস্যা নেই!"

কাকাবাবুও দু'বার বললেন, "হাকুনা মাটাটা, হাকুনা মাটাটা! আমিও মুখস্ত করে রাখি, যদি পরে কাজে লাগে।"

অরুণকান্তি বললেন, "আপনি কি এখানে বিশেষ কোনও কাজে যাচ্ছেন?"

কাকাবাবু বললেন, "না না, কোনও কাজে নয়, এমনিই বেড়াতে এসেছি। আমি আগে একবার কেনিয়ায় এসেছিলাম, তখন অনেক কিছুই দেখা হয়নি। নাইরোবিতে পি আর লোহিয়া নামে একজন ব্যবসায়ী আছেন, তিনি আমাকে নেমন্তন্ন করেছেন। তাঁর সঙ্গে আমার অনেকদিনের পরিচয়। তিনি আমাকে অনেক জায়গায় বেড়াবার ব্যবস্থা করে দেবেন বলেছেন। আফ্রিকা আমার খুব ভাল লাগে।"

অরুণকান্তি বললেন, "ওরে বাবা, পি আর লোহিয়া তো খুব নামী লোক। তাঁর অনেকরকম ব্যাবসা, অনেক ক্ষমতা। তবে তিনি অনেককে নানারকম সাহায্যও করেন। তা ছাড়া, আপনি জানেন নিশ্চয়ই, মি. লোহিয়া জঙ্গলের জন্তু-জানোয়ারদের অকারণে হত্যা করার ঘোর বিরোধী। এখানে অনেক চোরাশিকারি আছে। তাদের এক পাণ্ডার নাম স্যাম নিন্‌জানে। দু'মাস

আগে পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে। সব কাগজেই সে খবর বড় করে ছাপা হয়েছিল।”

কাকাবাবু বললেন, “হ্যাঁ, এ খবর আমিও শুনেছি। লোহিয়া বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের ব্যাপারে খুব উৎসাহী। বিশেষ করে কোথাও কোনও হাতি মারা পড়লে, সেকথা শুনেই তিনি কেঁদে ফেলেন। তিনি খুব হাতির ভক্ত।”

অরুণকান্তি বললেন, “কিন্তু আপনি কি এ খবর শুনেছেন, দিনদশেক আগে ওই স্যাম নিন্‌জানে জেলখানা থেকে পালিয়ে গিয়েছে?”

একথা শুনে কাকাবাবু খুব অবাক হলেন না। তিনি বললেন, “চোরাশিকারিদেরও অনেক টাকা। তারা পুলিশের হাতে ধরা পড়লেও কিছু লোককে ঘুষটুস খাইয়ে জেল থেকে বেরিয়ে আসে। এরকম তো অনেক দেশেই হয়। তবে আবার ধরা পড়বে নিশ্চয়ই।”

অরুণকান্তি বললেন, “আপনি আসছেন তো, ইচ্ছে করলেই ওই নিন্‌জানেকে আবার ধরিয়ে দিতে পারবেন।”

কাকাবাবু বললেন, “না না। আমার সেরকম ক্ষমতাই নেই। আমি বিদেশি, কোনও অপরাধীর পিছু ধাওয়া করব কী করে? সেটা আমার কাজই নয়। আমি ওসব ব্যাপারে মাথাই গলাব না। আমি শুধু নিশ্চিন্তে বেড়াতে চাই।”

আকাশ পরিষ্কার। ঝড়-ঝাপটা নেই। আর কোনও ঝামেলা হল না, বিমানটি পৌঁছে গেল নাইরোবি বিমানবন্দরে।

নীচে নেমে আসার পর হেমন্তিকা নামের সেই মহিলা কাকাবাবুর কাছে এসে বললেন, “আমাদের বাড়িতে আসতে হবে কিন্তু! আপনি কথা দিয়েছেন।”

কাকাবাবু বললেন, “হ্যাঁ, যাব। আচ্ছা বলো তো, রবীন্দ্রনাথের কোন গানে ‘নাই রবি’ আছে?”

মহিলা বেশ অবাক হয়ে বললেন, “রবীন্দ্রনাথ নাইরোবি নিয়ে গান লিখেছেন? রবীন্দ্রনাথ এখানে এসেছিলেন?”

কাকাবাবু বললেন, “রবীন্দ্রনাথ এখানে এসেছিলেন কি না, তা জানি না। রবীন্দ্রনাথ নাইরোবি নিয়ে গান লিখেছেন, তাও বলিনি। আমি বলছি, রবীন্দ্রনাথের কোন গানে ‘নাই রবি’ আছে?”

হেমন্তিকা বললেন, “তা তো জানি না।”

কাকাবাবু বললেন, “খুঁজে দ্যাখো। যেদিন তোমাদের বাড়ি যাব, সেদিন এই গানটা শুনতে চাই।”

বাইরে আসার পর অরুণকান্তি জিজ্ঞেস করলেন, "আপনাকে কেউ নিতে এসেছে?"

কাকাবাবু সামনের লোকজনের দিকে তাকিয়ে বললেন, "নাঃ, কে আর আসবে? সবই তো উলটোপালটা হয়ে গিয়েছে।"

অরুণকান্তি বললেন, "তা হলে আপনি কী করে যাবেন?"

কাকাবাবু বললেন, "একটা ট্যাক্সি নিয়ে কোনও হোটেলে উঠব। তারপর লোহিয়ার খোঁজ করব। ওঁর বাড়ির ফোনটা বোধহয় খারাপ, অনেকবার চেষ্টা করেও লাইন পাইনি।"

অরুণকান্তি বললেন, "আমি একটা অনুরোধ করব? আমি কাম্পালা থেকেই ফোন করে আমার অফিসকে সব খবর জানিয়েছি। অফিস থেকে গাড়ি পাঠাচ্ছে। আপনি আমার সঙ্গে চলুন। আমার বাড়িতে গিয়ে আজকের রাত্তিরটা বিশ্রাম নিন। কাল সকালে লোহিয়ার খোঁজ নেওয়া যাবে।"

কাকাবাবু বললেন, "এ তো ভালই প্রস্তাব। কিন্তু আমি গেলে তোমার কোনও অসুবিধে হবে না তো?"

অরুণকান্তি বললেন, "অসুবিধে আবার কী? আপনি গেলে আমি ধন্য হব। আপনি যেভাবে আমাদের সবাইকে বাঁচালেন...!"

কাকাবাবু বললেন, "থাক, ওকথা থাক। আমি তো কোনও বিরাট বীরপুরুষের মতো কিছু করিনি। ওটা হঠাৎ ঘটে গিয়েছে।"

অরুণকান্তি বললেন, "আমার তো অসুবিধের কোনও প্রশ্নই ওঠে না। আপনার কোনও অসুবিধে হবে না। কোম্পানি আমাকে বড় বাড়ি দিয়েছে, অনেক ঘর। তিনজন কাজের লোক। আমার স্ত্রী অবশ্য এখানে নেই, দেশে গিয়েছেন। তবে রান্নাবান্নার লোক আছে। আপনি যা খেতে ভালবাসেন, তাই-ই বানিয়ে দেবে।"

অরুণকান্তি কাকাবাবুকে সুটকেসও টানতে দিলেন না, নিজেই নিয়ে গিয়ে গাড়িতে তুললেন। বিরাট এসি গাড়ি, ড্রাইভারের সাদা পোশাক, মাথায় টুপি। বোঝাই যাচ্ছে, অরুণকান্তি বেশ বড় চাকরি করেন।

প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট লাগল তাঁর বাড়ি পৌঁছোতে।

নিরিবিলিতে ছিমছাম একটা দোতলা বাড়ি। সামনে অনেকখানি বাগান। অনেক বড় বড় গাছে ম্যাগনোলিয়া ফুল ফুটে আছে।

একতলাতেই অতিথিদের জন্য সাজানো একটা ঘর। কাকাবাবুকে আর সিঁড়ি ভেঙে দোতলায় উঠতে হল না। এ ঘরেই টিভি, ফোন সবই আছে।

সংলগ্ন বাথরুম। কোনও অসুবিধে নেই। অনেক রাত হয়ে গিয়েছে। কাকাবাবু স্নান সেরে নিলেন। কাম্‌পালায় অনেক কিছু খাইয়েছে, এখন আর বিশেষ কিছু খাওয়ার ইচ্ছে নেই। তবু অরুণকান্তির অনুরোধে খানিকটা মুরগির ঝোল আর ভাত খেতে হল।

খাওয়ার পর অরুণকান্তি বললেন, "আপনি এবার বিশ্রাম নিন। কাল সকালে কথা হবে।"

"গুড নাইট," বলে তিনি উপরে চলে গেলেন।

গতকাল থেকে খুব ধকল গিয়েছে। কাকাবাবু ভেবেছিলেন, খাওয়ার পরেই ঘুমে চোখ টেনে আসবে। কিন্তু বিছানায় শুয়েও তাঁর ঘুম এল না।

খুব সন্তুর কথা মনে পড়ছে।

প্রত্যেকবারই বাইরে কোথাও গেলে সন্তু সঙ্গে থাকে। গতবারেও সন্তু এসেছিল কেনিয়ায়। এখন সন্তুর পরীক্ষা চলছে। কয়েকটা দিন পিছিয়েও দেওয়া গেল না। কারণ, লোহিয়া জানিয়েছিলেন, এই সময়েই তাঁর সুবিধে। সামনের সপ্তাহেই তাঁকে অনেক দিনের জন্য চলে যেতে হবে আমেরিকায়।

কাল সকালে সন্তুকে ফোন করে জানতে হবে, পরীক্ষা কেমন হচ্ছে? জোজোও পরীক্ষা দিচ্ছে একই সঙ্গে।

ঘুম আসছে না কিছুতেই।

বই পড়লে ঘুম আসতে পারে, কাকাবাবু তাই বিছানার পাশের আলো জ্বেলে মহাভারত খুললেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে কর্ণের সঙ্গে দেখা হয়েছে কৃষ্ণের। কৃষ্ণ তাঁকে বললেন, 'তুমি তো আসলে কুন্তীরই ছেলে। পাণ্ডবদের ভাই। তুমি দুর্যোধনকে ছেড়ে এসে আমাদের পক্ষে যোগ দাও!'

কাকাবাবু পড়েই চলেছেন, ঘুমের নামগন্ধও নেই।

খানিক পর তিনি শুনতে পেলেন দরজায় ঠুকঠুক শব্দ।

কাকাবাবুর ভুরু কুঁচকে গেল। এত রাত্রে আবার কে আসবে?

অরুণকান্তি উপরে চলে গিয়েছেন। সব দরজা-জানলা বন্ধ রাখতে বলেছেন, নইলে অনেক রকম পোকামাকড় আসতে পারে। চোরের উপদ্রবও আছে।

আরও একবার সেই শব্দ হতে কাকাবাবু বিছানায় উঠে বসে জিজ্ঞেস করলেন, "কে?"

অরুণকান্তিরই গলা পাওয়া গেল। তিনি বললেন, "সরি কাকাবাবু, আপনি নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে পড়েছিলেন, আমি ডিসটার্ব করছি। একটা ব্যাপার ঘটেছে...!"

কাকাবাবু দরজা খুলে দিয়ে বললেন, "কী ব্যাপার?"

অরুণকান্তি ভিতরে ঢুকে এসে বললেন, "আপনি টিভি দেখেননি?"

কাকাবাবু বললেন, "টিভি? আমার তো টিভি দেখার তেমন অভ্যেস নেই।"

অরুণকান্তি বললেন, "রোজ রাতে কিছুক্ষণ টিভি না দেখলে আমার ঘুম আসতে চায় না। খবরটবর দেখি...!"

অরুণকান্তি এ ঘরের টিভিটা চালিয়ে দিলেন। তাতে ইংল্যান্ডের ফুটবল খেলা দেখাচ্ছে।

কাকাবাবু বিস্মিতভাবে অরুণকান্তির দিকে তাকালেন।

অরুণকান্তি বললেন, "দাঁড়ান, আবার নিশ্চয়ই দেখাবে।"

কয়েকমিনিট পরে শুরু হল বিজ্ঞাপন।

তারপরই দেখাল, বিশেষ সংবাদ, যাকে বলে ব্রেকিং নিউজ। তাতে লেখা ফুটে উঠল, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী পি আর লোহিয়ার বিশাল বাড়ি আগুন লেগে সম্পূর্ণ ভস্মীভূত। আগুন কীভাবে লাগল, পুলিশ তা অনুসন্ধান করে দেখছে। কেউ কেউ সন্দেহ করছে, এটা তাঁর শত্রুপক্ষের কাজ। পি আর লোহিয়াকেও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তিনি আগুনে পুড়ে মারা যাননি, এটা নিশ্চিত। ধ্বংসস্তূপে তাঁর কোনও চিহ্ন পাওয়া যায়নি।

মি. লোহিয়া বাইরে যাওয়ার সময় একটা মোবাইল ফোন সঙ্গে রাখেন। সেটা আধপোড়া অবস্থায় উদ্ধার হয়েছে। সুতরাং তিনি নিজে কোথাও চলে গিয়েছেন কিনা তা বোঝা যাচ্ছে না।

মি. লোহিয়ার কেউ সন্ধান দিতে পারলে তাঁকে পাঁচ লক্ষ ডলার পুরস্কার দেওয়া হবে।

খবরটা দেখার পর দু'জনেই একটুক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন।

তারপর অরুণকান্তি বললেন, "এরকম ঘটনা এখানে আগেও কয়েকবার ঘটেছে। কারও সঙ্গে শত্রুতা থাকলে বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়। লোহিয়া অত বড় ব্যবসায়ী, তাঁর তো অনেক শত্রু থাকবেই। বিশেষত, 'রয়াল পাওয়ার' নামে একটা ব্রিটিশ কোম্পানির মালিক অ্যান্ড্রু লয়েড নামে এক সাহেবের সঙ্গে তাঁর ঝগড়া ও মুখ দেখাদেখি বন্ধ ছিল। আমার তো মনে হয়, লোহিয়ার ব্যাবসার ক্ষতি করার জন্য ওই ব্রিটিশ কোম্পানিই গুন্ডা লাগিয়ে এ কাজ করেছে। এ কাজের জন্য এখানে গুন্ডা ভাড়া পাওয়া যায়।"

কাকাবাবু বললেন, "কিন্তু লোহিয়া গেলেন কোথায়? তিনি কি আগুন

লাগার সময় পালিয়ে গিয়েছেন? কিংবা তাঁকে ধরে নিয়ে গিয়েছে?"

অরুণকান্তি বললেন, "সেটা কয়েক দিনের মধ্যেই জানা যাবে। যদি কেউ ধরে নিয়ে যায়, নিশ্চয়ই মুক্তিপণ দাবি করবে।"

কাকাবাবু বললেন, "পাঁচ লাখ ডলারের পুরস্কার তো ঘোষণা করা হয়েই গিয়েছে।"

অরুণকান্তি বললেন, "কাকাবাবু, পাঁচ লাখ ডলার আমাদের দেশের টাকার হিসেবে অনেক টাকা, কিন্তু এখানে বড় ব্যবসায়ীদের পাঁচ লাখ ডলার কিছুই নয়। এদের কোটি কোটি ডলারের কারবার। মি. লোহিয়ার যে বাড়িখানা ধ্বংস হয়ে গেল, সেটার দামই তো অন্তত দু'-তিন কোটি ডলার।"

কাকাবাবু বললেন, "আগুন লেগেছে কাল রাত্তিরে। লোহিয়া আমাকে তাঁর বাড়িতে থাকতে বলেছিলেন। আমি ঠিক সময় পৌঁছোলে হয়তো আগুন লাগার সময় ওই বাড়িতেই থাকতাম।"

অরুণকান্তি বললেন, "আপনি থাকলে হয়তো আগুন লাগতই না। আপনি কোনও না-কোনওভাবে ঠিক লোকগুলোকে ধরে ফেলতেন। আপনার যা ক্ষমতা দেখছি!"

কাকাবাবু বললেন, "ধ্যাত। আমার সেরকম ক্ষমতাই নেই। আগুন লাগলে হয়তো আমি পুড়েই মরতাম। আমার তো দৌড়ে পালাবার ক্ষমতা নেই।"

একটু পরে অরুণকান্তি বললেন, "অবশ্য আপনি এসে পড়েছেন, আপনার বেড়াবার কোনও অসুবিধে হবে না। আমি কয়েকদিন ছুটি নেব, আপনাকে আশপাশের কয়েকটা জায়গা ঘুরিয়ে দেখিয়ে আনব।"

কাকাবাবু বললেন, "লোহিয়া আমার বন্ধু মানুষ। তিনি আমাকে এখানে নেমন্তন্ন করে এনেছেন, তাঁর এত বড় বিপদের সময় আমার কি আর বেড়াতে ভাল লাগবে? তাঁর কী হল, কোথায় গেলেন, সেটাই আগে জানা দরকার।"

অরুণকান্তি চলে যাওয়ার পর কাকাবাবু আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়লেন। লোহিয়ার কথাই ভাবতে লাগলেন। তারপর একসময় ঘুমিয়ে পড়লেও জেগে উঠলেন বেশ ভোরে।

বাইরে বেরিয়ে কিছুক্ষণ বাগানে ঘুরলেন তিনি। একটু শীত শীত লাগছে। এখন কলকাতায় খুব গরম, এখানে সোয়েটার কিংবা চাদর গায়ে দিলে ভাল হয়।

কাকাবাবুর মনটা বেশ অস্থির হয়ে আছে। কোনও কবিতা কিংবা গান ভাববার চেষ্টা করেও পারছেন না।

ব্রেকফাস্ট টেবিলে অরুণকান্তি বললেন, "আমার একবার বিকেলের দিকে অফিসে গেলেই চলবে। সকালে কোথায় বেড়াতে যাবেন বলুন?"

কাকাবাবু বললেন, "বেড়াবার বদলে আমি একবার লোহিয়ার আগুন-লাগা বাড়িটা দেখে আসতে চাই। তুমি চেনো সেই বাড়িটা?"

অরুণকান্তি বললেন, "সেটা এ শহরের একটা বিখ্যাত বাড়ি ছিল। ওটা আগে ছিল একজন ইংরেজের বাড়ি। লোহিয়া সেটা কিনে নিয়ে আরও অনেক বাড়িয়ে ছিলেন। চতুর্দিকে বারান্দা, আর সব বারান্দা ঝুলন্ত ফুলের টব দিয়ে সাজানো। চলুন, সেদিকেই যাই।"

নাইরোবি শহরটার পশ্চিম দিকটাতেই ছিল বেশিরভাগ ইংরেজদের বাড়ি।

গাড়ি চালাতে চালাতে অরুণকান্তি বললেন, "আমাদের কলকাতা শহরটার মতো নাইরোবি শহরও অনেকটা ইংরেজ সাহেবরাই বানিয়েছে। কলকাতায় সাহেবরা যেমন থাকত চৌরঙ্গি-পার্ক স্ট্রিট অঞ্চলে, এখানেও সাহেবরা থাকত নানগাটা, হাইরিজ এইসব পাড়ায়। এখনও কিছু কিছু সাহেব রয়ে গিয়েছে। তবে, একসময় ওসব পাড়ায় সাদা চামড়ার লোকরা ছাড়া কালো মানুষদের থাকার কোনও অধিকারই ছিল না। এখন কিছু কিছু কেনিয়ান, ভারতীয়, চিনারাও বাড়ি কিনে নিয়েছে।"

পাড়াগুলো বেশ সুন্দর, পরিষ্কার, ছিমছাম।

গাড়িটা উঠতে লাগল খানিকটা উঁচুমতো একটা টিলার দিকে। আকাশ একেবারে পরিষ্কার, ঝকঝক করছে রোদ। এই রোদে গরম লাগে না।

কাকাবাবু খুব অবাক হয়ে বললেন, "আরে! আগে শহরের এদিকটায় আসিনি। এখান থেকে কিলিমাঞ্জারো পাহাড় দেখা যায়?"

অরুণকান্তি বললেন, "হ্যাঁ, ওই তো দেখা যাচ্ছে। রোজ দেখা যায় না, শুধু পরিষ্কার দিনেই।"

কাকাবাবু বললেন, "ইস, আমাদের কলকাতা থেকে যদি কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যেত, কী ভাল হত! পাহাড় দেখতে হলে আমাদের অনেক দূরে যেতে হয়!"

অরুণকান্তি বললেন, "আমাদের এখানে তো চতুর্দিকেই পাহাড় আর জঙ্গল।"

একটু যেতে না-যেতেই দেখা গেল কিছু লোক দৌড়োদৌড়ি করছে রাস্তা দিয়ে। তারা কোনও কারণে ভয় পেয়েছে মনে হয়!

লোকগুলো কাকাবাবুদের গাড়িটার পাশ দিয়ে যেতে যেতে কী যেন বলে গেল, তার মানে বোঝা গেল না।

তারপরই দেখা গেল, রাস্তার মাঝখানে একজোড়া চিতাবাঘ!

অরুণকান্তি সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি থামিয়ে বললেন, "কাকাবাবু, কাচ তুলে দিন। চিতাবাঘ খুবই হিংস্র। কিন্তু কাচ বন্ধ থাকলে কিছু করতে পারবে না।"

কাকাবাবু বললেন, "চিতাবাঘ একেবারে শহরের মধ্যে ঢুকে পড়ল কী করে? জঙ্গলের দিকে জাল ঘেরা আছে না?"

অরুণকান্তি বললেন, "কী হয়েছে বুঝতে পেরেছি। সিংহ কখনও কখনও ঢুকে পড়ে শুনেছি, কিন্তু চিতাবাঘ কখনও শহরে আসে না। মি. লোহিয়ার বাড়িতে বেশ কিছু জন্তু-জানোয়ার ছিল। ওঁর নিজস্ব চিড়িয়াখানা। জন্তুগুলো ওঁর প্রায় পোষাই ছিল বলতে গেলে। বাড়িতে আগুন লাগার ফলে সেই জন্তুগুলো সব বেরিয়ে পড়েছে।"

চিতাবাঘ দুটো বসে পড়েছে রাস্তার ঠিক মাঝখানে।

কাকাবাবু বললেন, "কী সুন্দর দেখতে! আমাদের নর্থ বেঙ্গলেও লেপার্ড বা চিতাবাঘ আছে বটে, কিন্তু সেগুলো ছোট ছোট। আফ্রিকার চিতা অনেক বড়।"

অরুণকান্তি বললেন, "এরা সাংঘাতিক হিংস্র আর সব প্রাণীর মধ্যে এরাই সবচেয়ে জোরে দৌড়োতে পারে।"

পিছনে আরও দু'-তিনটে গাড়ি এসে গিয়েছে। তারা হর্ন দিতে লাগল। অরুণকান্তিও বাজাতে লাগলেন হর্ন। চিতা দুটো সেই আওয়াজে যেন বেশ বিরক্ত হয়ে ঢুকে গেল রাস্তার পাশের একটা ঝোপে।

অরুণকান্তি গাড়িতে আবার স্টার্ট দিয়ে বললেন, "এ শহরের লোকেরা জানে যে, চিতারা আওয়াজ সহ্য করতে পারে না। কিন্তু যদি কোনও হাতি এসে পড়ত, সহজে সরে যেত না। মি. লোহিয়ার চিড়িয়াখানায় হাতিও ছিল নিশ্চয়ই।"

টিলাটার উপরের দিকে বেশ কিছু মানুষের ভিড় রয়েছে। এখানেই ছিল সেই বিখ্যাত বাড়ি। এখনও কয়েক জায়গায় ধিকিধিকি করে জ্বলছে আগুন। দু'খানা দমকলের গাড়ি জলের ফোয়ারা ছিটিয়েই চলেছে। উদ্ধারকর্মীরা ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে সরিয়ে খুঁজছে, কেউ চাপা পড়ে আছে কি না।

একপাশে একজন ব্যক্তিকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে বেশ কিছু সাংবাদিক আর টিভি ক্যামেরা। অরুণকান্তি গাড়ি থেকে নেমে বললেন, "চলুন, ওই দিকে যাই। ওই ভদ্রলোককে চিনি, উনি চমনলাল দেওয়ান, মি. লোহিয়ার

ব্যাবসার একজন পার্টনার। লোহিয়ার কীরকম আত্মীয়ও যেন হন। ইনি আবার একজন নামি সাঁতারু!”

লোহিয়ার সঙ্গে এই ব্যক্তিটির চেহারার অনেক তফাত। লোহিয়া রোগা-পাতলা, শান্ত ধরনের মানুষ। কথা বললে বোঝাই যায় না, তিনি এত বড় একজন ব্যবসায়ী, অঢেল টাকার মালিক। আর এই ব্যক্তিটি লম্বা-চওড়া, দশাসই পুরুষ, মস্তবড় গোঁফ। গলার আওয়াজটাও বাজখাঁই।

তাঁর কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়িয়ে কাকাবাবু ঘাড় ঘুরিয়ে সবদিক দেখতে লাগলেন। এমন আশ্চর্য সুন্দর বাড়ি ধ্বংস হয়ে গেল! তাঁর এ বাড়িতেই থাকার কথা ছিল। নিশ্চয়ই খুব ভাল লাগত!

সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে চমনলাল বললেন, “না, এখনও মি. লোহিয়ার কোনও খবর পাওয়া যায়নি। কেউ তাঁর মুক্তিপণ দাবিও করেনি। আগুন লেগেছিল মধ্য রাত্তিরে, তখন তিনি এ বাড়িতেই ঘুমিয়ে ছিলেন। আমরা সবাই তখন ঘুমিয়ে ছিলাম। আগুন লাগার পর অ্যালার্ম বেল বেজে ওঠে। আমরা সবাই ছুটোছুটি করে বাইরে বেরিয়ে গিয়েছিলাম। তখন থেকেই তাঁকে দেখতে পাইনি।”

একজন সাংবাদিক জিজ্ঞেস করল, “উনি কি একলা একলা বাড়ির বাইরে যান?”

চমনলাল বললেন, “না, কখনও কোথাও একলা যান না। আমাকে না জানিয়েও কোথাও যাবেন না। সেইজন্যই তো ব্যাপারটা আরও রহস্যময় লাগছে।”

আর-একজন সাংবাদিক জিজ্ঞেস করল, “এই বাড়ির এতখানি অংশ পুড়ে গেল, নিশ্চয়ই অনেকটা সময় লেগেছে। তার মধ্যে আগুন নেভানো গেল না? নিশ্চয়ই সে ব্যবস্থা ছিল।”

চমনলাল বললেন, “ব্যবস্থা তো সবই আছে। কিন্তু অত রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে উঠে ব্যাপারটা বুঝতেই খানিকটা সময় লাগে। তা ছাড়া, আমাদের শত্রুপক্ষ আগে অনেকখানি জায়গায় পেট্রল ছড়িয়ে দিয়েছিল। চারজন আর্মড গার্ড আছে, তারা কিছুই টের পায়নি। ঘুমোচ্ছিল বোধহয়। কেউ কেউ নাকি দুটো বোমার আওয়াজও শুনেছে।”

এবার দু’-তিনজন সাংবাদিক একসঙ্গে বলে উঠল, “শত্রুপক্ষ? আপনি জানেন যে শত্রুপক্ষই আগুন লাগিয়েছে? শত্রুপক্ষ বলতে কারা, তাও আপনি জানেন?”

চমনলাল বললেন, "অবশ্যই জানি। দেখুন, আমি রেখে-ঢেকে কথা বলতে পারি না। আমাদের প্রধান শত্রুপক্ষ হচ্ছে 'হাইল্যান্ড ওভারসি'জ কোম্পানি'। ওদের মালিক জোসেফ এনক্রুমার সঙ্গে গত সপ্তাহেই আমার খুব ঝগড়া হয়েছিল। সে আমাকে শাসিয়ে ছিল যে, এ দেশ থেকে আমাদের ব্যাবসা গুটিয়ে নিতে বাধ্য করবে। সে-ই এ বাড়িতে আগুন লাগিয়েছে। আমি এর প্রতিশোধ নেবই। ওই জোসেফ এনক্রুমাকেই আমি এ দেশ ছাড়া করব।"

কাকাবাবুর এসব শুনতে ভাল লাগছে না। তিনি অরুণকান্তির দিকে তাকিয়ে চোখের ইঙ্গিতে বললেন, "চলো, এবার ফিরে যাই।"

অরুণকান্তি বললেন, "আর-একটু দাঁড়ান।"

তিনি হাত তুলে চমনলালের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন, "দেওয়ানজি, আমি একটা কথা বলতে চাই। আমার সঙ্গে একজন এসেছেন, তিনি লোহিয়াজির বন্ধু ছিলেন।"

চমনলাল শুকনোভাবে বললেন, "হ্যাঁ, এখন অনেকেই দেখা করতে আসছে। কিন্তু আমি এখন একটু ব্যস্ত আছি।"

অরুণকান্তি আবার বললেন, "লোহিয়াজি ওঁকে নেমন্তন্ন করেছিলেন। ওঁর এই বাড়িতেই ওঠার কথা ছিল।"

চমনলাল বললেন, "বাড়ির অবস্থা তো দেখছেন। এখন তো আমি ওঁকে এখানে থাকার জায়গা দিতে পারব না।"

অরুণকান্তি বললেন, "না না, থাকার জায়গার সমস্যা নেই। উনি আমার কাছে থাকবেন। উনি ইন্ডিয়া থেকে এসেছেন। ওঁর নাম রাজা রায়চৌধুরী, খুব বিখ্যাত মানুষ। উনি অনেক বড় বড় কেসে অনেক সমস্যার সমাধান করেছেন। উনি লোহিয়াজির সন্ধান পাওয়ার ব্যাপারে আপনাকে সাহায্য করতে পারেন।"

চমনলাল একবার কাকাবাবুর দিকে তাকিয়ে দেখে খানিকটা বিদ্রূপের সুরে বললেন, "আমার তো কারও সাহায্যের দরকার নেই। ঠিক আছে, ধন্যবাদ। নমস্কার। আর কেউ কোনও প্রশ্ন করবেন?"

কাকাবাবু এর মধ্যে উলটো দিকে হাঁটতে শুরু করেছেন। অরুণকান্তি তাঁর কাছে এসে বললেন, "লোকটা কীরকম অভদ্র দেখলেন? আমার কথা ভাল করে শুনলই না।"

কাকাবাবু বেশ বিরক্ত হয়েছেন। গম্ভীরভাবে বললেন, "তোমার

ওরকমভাবে কথা বলা উচিত হয়নি। এর পর থেকে তুমি কোথাও আমার পরিচয় দিতে গিয়ে বিখ্যাত লোক, আমি হ্যানো করেছি, ত্যানো করেছি, এসব কিচ্ছু বলবে না। এখানে আমাকে কেউ চেনে না। আমি সেরকমভাবেই থাকতে চাই।"

॥ ৪ ॥

পরীক্ষার হল থেকে বেরিয়ে সন্তু জোজোকে জিজ্ঞেস করল, "সব ক'টা লিখেছিস?"

জোজো বলল, "তোর এত দেরি হল কেন? আমি তো অনেক আগেই সব শেষ করে বসে আছি।"

সন্তু বলল, "আজ তো এক্ষুনি বাড়ি ফেরার কোনও মানে হয় না। এখন কী করা হবে, ভেবে রেখেছিস?"

জোজো বলল, "আগে এখান থেকে পালা! শিগ্‌গির!"

সন্তু একটু অবাক হয়ে বলল, "কেন, পালাতে হবে কেন?"

জোজো সন্তুর হাত টেনে ধরে বলল, "অন্য বন্ধুরা ধরবে! পরীক্ষা শেষ হলে সবাই দলবেঁধে সিনেমা দেখতে যায়! একেবারে টিপিক্যাল। যেন আমরা অন্য সময় সিনেমা দেখি না। রাহুল, অনিন্দ্যরা আমাকে সিনেমা দেখার কথা বলেও রেখেছে। আমাদের নতুন কিছু করতে হবে।"

প্রায় দৌড়েই ওরা রাস্তা পেরিয়ে চলে এল খানিকটা দূরে একটা পার্কের কাছে।

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "তা হলে নতুন কী করবি?"

জোজো বলল, "তুই মনুমেন্টের উপরে কখনও উঠেছিস?"

সন্তু বলল, "মনুমেন্ট! না। ওঠা যায় বুঝি?"

জোজো বলল, "কেন যাবে না? ভিতরে সিঁড়ি আছে। আজ আমরা মনুমেন্টের মাথায় উঠব। উঠে চিৎকার করে বলব। শোনো বন্ধু, শোনো! আজ আমাদের পরীক্ষা শেষ হল! আজ আমরা স্বাধীন! তা ধিন তা ধিন তা ধিন!"

সন্তু হাসতে হাসতে বলল, "স্বাধীন কী রে? পরীক্ষা শেষ হল, তা বলে তো পড়াশুনো শেষ হয়নি! এখনও আরও তিন বছর...!"

জোজো বলল, "তুই পড়বি! তুই তো ফিজিক্স পড়তে চাস। আমি আর এসব লাইনে নেই। আমি আর্ট কলেজে ভরতি হব।"

সন্তু বলল, "তুই আর্ট কলেজে চান্স পাবি?"

জোজো দুই ভুরু তুলে বলল, "আমি চান্স পাব না? আমি জোজোমাস্টার, মাত্র আঠারো সেকেন্ডে যে-কোনও মানুষের মুখ এঁকে দিতে পারি। ওয়ার্ল্ড রেকর্ড হচ্ছে সতেরো সেকেন্ড। পিকাসো পারতেন, আমার এক সেকেন্ড বেশি লাগে।"

সন্তু বলল, "তুই যদি এতই ভাল পারিস, তা হলে তোর আর্ট কলেজে আর শেখার দরকার কী?"

জোজো বলল, "ঠিক বলেছিস। এটা ভেবে দেখতে হবে। চল, এখন মনুমেন্টে যাই।"

পরীক্ষার শেষদিন বলে ওদের দু'জনেরই বাড়ি থেকে একশো টাকা করে হাতখরচ দেওয়া হয়েছিল। একটা ট্যাক্সি ধরে ওরা চলে এল ময়দানে মনুমেন্টের কাছে। যেখান দিয়ে মনুমেন্টে ঢুকতে হয়, সেখানে একটা লোহার দরজায় দুটো মোটা মোটা তালা ঝুলছে।

সন্তু হতাশভাবে বলল, "যাঃ!"

জোজো বলল, "ঘাবড়াচ্ছিস কেন? চাবি ঠিক জোগাড় হয়ে যাবে। আর চাবি যদি না পাই, তা হলে তালা দুটো ভেঙে ফেললেই হবে।"

সন্তু বলল, "সে কী রে, তালা ভাঙবি কী? তা হলে আমাদের পুলিশে ধরবে না? ওই দ্যাখ, একজন পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে।"

কাছেই একজন কনস্টেবল এক আলুকাবলিওয়ালার কাছ থেকে আলুকাবলি খাচ্ছে।

জোজো তার কাছে গিয়ে বলল, "অফিসার সাহেব, আপনার কাছে কি এই গেটটার চাবি আছে?"

কনস্টেবলটি হাসিহাসি মুখে বলল, "আমি অফিসারও নই, সাহেবও নই। এই চাবিও আমার কাছে নেই। এই চাবি থাকে লালবাজারে।"

জোজো বলল, "আপনি অফিসার নন, চাবিও আপনার কাছে নেই। তা হলে আপনি এখানে দাঁড়িয়ে আছেন কেন?"

কনস্টেবলটি জোজোর পা থেকে মাথা পর্যন্ত চোখ বুলিয়ে বলল, "কেন, আমি এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে তোমার আপত্তি আছে নাকি?"

জোজো বলল, "না, আপনি দাঁড়িয়ে থাকতে চান তো থাকুন। আমরা এই

গেটের তালা দুটো ভাঙলে আপনি সেদিকে তাকাবেন না!"

কনস্টেবলটি বলল, "তালা ভাঙবে? তাই নাকি? তা হলে তো তোমাকে অ্যারেস্ট করতেই হবে! সোজা নিয়ে গিয়ে লকআপে পুরে দেব। বেশি তেড়িবেড়ি করলে ডান্ডা বেড়ি খেতে হবে।"

জোজো বলল, "তেড়িবেড়ি মানে কী? ডান্ডা বেড়ি মানেই বা কী?"

কনস্টেবলটি বলল, "সে যখন হবে, তখন বুঝবে!"

জোজো এবার বেশ তেজের সঙ্গে বলল, "আমাকে লকআপে পুরবেন? জানেন আমি কে? পুলিশ কমিশনার গৌতমমোহন চক্রবর্তী আমার মামা! আমি জোজো, তাঁর ভাগনে। আমার গায়ে হাত ছোঁয়াবার সাহস হবে আপনার? পরশুই তো গৌতমমামা আমাদের বাড়িতে এসেছিলেন আমপোড়া শরবত খেতে। আমার মায়ের হাতের লাউ-চিংড়ি খেতেও উনি খুব ভালবাসেন।"

কনস্টেবলটি এবার আলুকাবলিওয়ালার দিকে তাকিয়ে বলল, "গত সপ্তাহেই একটা পাগল এসেছিল, তুমি তো দেখেছিলে, তাই না? এইখানে ডিগবাজি খাচ্ছিল। আর বারবার বলছিল, পুলিশ কমিশনার তার মামা। একবার বলেনি, অন্তত দশবার।"

সে এবার জোজোর দিকে ফিরে বলল, "সেও ভাগনে, তুমিও ভাগনে, তা হলে সেই পাগলটি কি তোমার ভাই?"

জোজো বলল, "নিশ্চয়ই! দুনিয়ার সব পাগলই আমার ভাই! আর পুলিশ কমিশনারদের অনেক ভাগনে থাকে।"

সন্তু কাছে এসে জোজোর হাত ধরে টেনে বলল, "অ্যাই, চল! এখানে সুবিধে হবে না। অন্য কোথাও যাই।"

জোজো বলল, "আমার মনুমেন্টে চড়তে ইচ্ছে করছে। অন্য কোথাও যাব কেন? কোথায় যাব?"

সন্তু বলল, "গঙ্গার ধারে গিয়ে বরং একটা স্টিমারে উঠে পড়ি।"

এই সময় একটা আশ্চর্য কাণ্ড হল। প্যাঁ পোঁ আওয়াজ করে তিন-চারখানা পুলিশের গাড়ি এসে থামল কাছেই। ঝটপট করে কয়েকজন পুলিশ সেই সব গাড়ি থেকে নেমে সারবেঁধে দাঁড়াল। আর-একটা সাদা রঙের গাড়ি থেকে নামলেন একজন বেশ লম্বামতো মানুষ, তাঁর মাথার চুল ধপধপে সাদা। একজন মহিলা আর দুটি বাচ্চাও নামল সেই গাড়ি থেকে।

সন্তু বলল, "চল জোজো, কেটে পড়ি। এখানে আর আমাদের দাঁড়াতে দেবে না।"

জোজো বলল, "আর-একটু দাঁড়া না, দেখি। এই ভদ্রলোক কে রে? পুলিশ এত খাতির করছে?"

সন্তু বলল, "ইনি তো আমাদের রাজ্যপাল, গোপালকৃষ্ণ গাঁধী। কাগজে ফোটো দেখিসনি?"

জোজো বলল, "হ্যাঁ, সেইজন্যই চেনা চেনা মনে হচ্ছিল।"

পুলিশরা রাজ্যপালকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে, যাতে কেউ কাছে না যায়। জোজো হঠাৎ এক পুলিশের বগলের তলা দিয়ে গলে দৌড়ে রাজ্যপালের কাছে গিয়ে হাজির হল। তারপর বলল, "স্যার, আমি আপনাকে একটা কথা বলতে চাই!"

একজন পুলিশ অফিসার জোজোর কাঁধ ধরে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছিল, রাজ্যপাল তাকে বারণ করলেন।

তিনি বাংলা শিখেছেন, বাংলাতেই মিষ্টি করে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি আমাকে কী বলতে চাইছিলে, বলো!"

জোজো বলল, "স্যার, আমি আর আমার বন্ধু, ওই যে একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে, আজ আমাদের পার্ট-টু পরীক্ষা শেষ হল। আমরা এই মনুমেন্টের উপরে আজ উঠে দেখতে চাই। পুলিশরা আমাদের উঠতে দিচ্ছে না।"

রাজ্যপাল বললেন, "ও, এই কথা! আমিও তো আজ এর উপরে উঠব বলেই এসেছি। এটার ভিতরের অবস্থাটা কেমন, তাও দেখতে হবে। তোমরা দু'জনেও এসো আমার সঙ্গে। পুলিশ কিছু বলবে না।"

জোজো এবার বিজয়ীর ভঙ্গিতে পিছন ফিরে বলল, "অ্যাই সন্তু, চলে আয়। আমরা মনুমেন্টের উপরে উঠব। তোকে বলেছিলুম না...!"

প্রথম দেখা কনস্টেবলটির দিকেও হাত নেড়ে দিয়ে জোজো বলল, "টা টা।"

সে বেচারি একেবারে হতভম্ব হয়ে গিয়েছে।

মনুমেন্টের ভিতরে ঘোরানো সিঁড়ি, অন্ধকার অন্ধকার। বোঝাই যায়, রাজ্যপাল আসবেন বলে আজ কিছুটা পরিষ্কার করা হয়েছে। একটুখানি ওঠার পর হঠাৎ ফরফর শব্দ হতেই জোজো ভয় পেয়ে থেমে গেল।

সন্তু বলল, "ভয়ের কিচ্ছু নেই। ওগুলো চামচিকে।"

জোজো বলল, "ভয় পাইনি। বিচ্ছিরি গন্ধ।"

সন্তু বলল, "এখানে অনেকদিন মানুষ ঢোকেনি মনে হচ্ছে। তাই কীরকম যেন ভ্যাপসা গন্ধ। চামচিকে ছাড়া বাদুড়ও থাকতে পারে।"

জোজো বলল, "বাদুড়? তা হলে আমি উঠব না।"

বাদুড় অবশ্য দেখা গেল না। রাজ্যপাল আস্তে আস্তে উঠছেন, ওরা দু'জন আগে উঠে গেল তরতরিয়ে। সবচেয়ে উঁচুতে। এখানে হু হু করছে হাওয়া। মনে হয়, পুরো কলকাতা শহরটাই দেখা যাচ্ছে এখান থেকে। খানিক পরে রাজ্যপাল এসে প্রথমে জানতে চাইলেন, ওরা দু'জন কোথায় থাকে, কী পড়ে।

জোজো বলল, "এটার গেট তালাবন্ধ থাকে কেন? সবাই এসে কেন দেখতে পারে না?"

রাজ্যপাল বললেন, "পুলিশকে জিজ্ঞেস করেছি সেকথা। আগে প্রতি রোববার দর্শকদের জন্য খোলা থাকত। স্কুলগুলো থেকে দলবেঁধে আসত ছেলেমেয়েরা। এখন পুলিশ বলছে, এটা খুব পুরনো হয়ে গিয়েছে তো, বেশি লোক এলে যদি ভেঙেটেঙে পড়ে, তাই আর গেট খোলা হয় না।"

জোজো বলল, "পুরনো হয়েছে, সারিয়ে নিলেই পারে।"

রাজ্যপাল বললেন, "ঠিক। বলব সেকথা। তবে কী জানো, এটা যখন তৈরি হয় তখন তো কলকাতা শহরে এর চেয়ে বড় কিছু ছিল না। চারদিকটা অনেক ফাঁকা ছিল। তখন নাকি এখান থেকে সুন্দরবন পর্যন্ত দেখা যেত। এখন তো প্রায় সবদিকেই উঁচু উঁচু বাড়ি। হরাইজন, হরাইজন-এর বাংলা কী যেন?"

সন্তু বলল, "দিগন্ত।"

রাজ্যপাল বললেন, "ইয়েস, দিগন্ত। দিগন্ত আড়াল হয়ে গিয়েছে।"

উলটো দিকে ফিরে তিনি বললেন, "এই দিকটা তবু ফাঁকা আছে। গঙ্গা নদী। অনেক জাহাজ দেখা যাচ্ছে।"

জোজো বলল, "জাহাজ দেখলেই আমার ইচ্ছে করে উঠে পড়ে কোনও দূর দেশে চলে যাই।"

রাজ্যপাল বললেন, "আমারও ছেলেবেলায় সেরকম ইচ্ছে হত। সব বালকই বোধহয় দূরে কোথাও যাওয়ার স্বপ্ন দেখে। আমি বন্দরে গিয়ে বসে থাকতাম। আমার কোথায় যেতে ইচ্ছে করত জানো? সাউথ আফ্রিকায়। ওখানে আমার গ্র্যান্ডফাদার, মানে ঠাকুরদা থাকতেন তো একসময়।"

সন্তু বলল, "মহাত্মা গাঁধী। তখন উনি ব্যারিস্টার ছিলেন।"

রাজ্যপাল মাথা নাড়লেন।

জোজো বলল, "আমাদেরও খুব আফ্রিকায় যেতে ইচ্ছে করে। কেনিয়ায়।"

রাজ্যপাল ভুরু কুঁচকে বললেন, "কেনিয়ায়? সেখানে কেন? সেখানে তোমাদের চেনাশুনো কেউ থাকে?"

জোজো বলল, "থাকেন না, আমাদের কাকাবাবু সেখানেই গিয়েছেন। অনেকবার কাকাবাবু যেখানে যান, আমাকে আর আমার এই বন্ধু সন্তুকে সঙ্গে নিয়ে যান। এবারে তিনি আমাদের না নিয়ে একাই চলে গিয়েছেন।"

রাজ্যপাল জিজ্ঞেস করলেন, "এবারে তোমাদের সঙ্গে নেননি কেন?"

জোজো বলল, "আমাদের তো পরীক্ষা চলছিল। আজই শেষ হয়ে গেল। কাকাবাবু যদি আর কয়েকটা দিন অপেক্ষা করতেন, তা হলে আমরাও যেতে পারতাম! জানেন, আমাদের কাকাবাবু খুব বিখ্যাত মানুষ, তিনি...!"

সন্তু জোজোর পিঠে একটা চিমটি কাটল।

কাকাবাবু অন্যদের কাছে তাঁর সম্পর্কে বড় বড় কথা বলা একদম পছন্দ করেন না। বারণ করে দিয়েছেন। জোজোর মনে থাকে না। সন্তুর চিমটি খেয়ে সে থেমে গেল। রাজ্যপালও এই সময় মুখ ফিরিয়ে তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন।

রাজ্যপাল আবার এদিকে তাকাতেই জোজো বলল, "স্যার, আপনি একটু ব্যবস্থা করে দিন না। একটা জাহাজ কোম্পানিকে বলে দিন, আমাদের কেনিয়া নিয়ে যাবে।"

রাজ্যপাল হেসে বললেন, "তুমি তো ভারী দুষ্টু ছেলে? ভেবেছ, রাজ্যপালকে দিয়ে যা খুশি করিয়ে নেওয়া যায়? জাহাজ কোম্পানি আমার কথা শুনবে কেন? তা ছাড়া কাকাবাবু তোমাদের নিয়ে যাননি, ভালই করেছেন। পরীক্ষা শেষ হলেও তোমাদের পড়াশুনো তো শেষ হয়নি। এই বয়সটায় স্বপ্ন দেখবে, বড় হয়ে সত্যি সত্যি বেড়াতে যাবে দূর দূর দেশে।"

তারপর তিনি সন্তুর দিকে তাকিয়ে বললেন, "এই ছেলেটি বেশ শান্ত। ভাল ছেলে।"

জোজো বলল, "ভাল ছেলে? আপনি জানেন না, ও কীরকম রিভলবারে গুলি চালাতে পারে!"

রাজ্যপাল চমকে উঠে বললেন, "অ্যাঁ? গুলি চালায়?"

সন্তু বলল, "মোটেই আমি গুলি চালাই না। আমার কাকাবাবু আমাকে

রিভলবার চালানো শিখিয়ে দিয়েছেন। যাতে খুব বিপদে পড়লে আত্মরক্ষা করতে পারি।"

রাজ্যপাল বললেন, "গুড। আশা করি, সেরকম বিপদে তোমাকে কখনও পড়তে হবে না।"

রাজ্যপালকে তাঁর স্ত্রী ডাকতেই তিনি ওদের বললেন, "এবার তো আমায় চলে যেতে হচ্ছে।"

রাজ্যপাল নেমে যাওয়ার পর পুলিশও আর ওদের থাকতে দিল না।

নীচে নেমে এসে সন্তু বলল, "আয়, এবার ফুচকা খাই।"

জোজো নাক কুঁচকোল।

সন্তু এসব ভালবাসে, জোজো রাস্তার খাবার একেবারে পছন্দ করে না। দোকানের কচুরি-তরকারি তার ভাল লাগে।

সন্তু বলল, "কচুরি-তরকারি পরে খাব। ওই যে ফুচকা পাওয়া যাচ্ছে।"

জোজো অগত্যা রাজি হল। জোজো একদম ঝাল খেতে পারে না, সন্তুর আবার ঝাল চাই। জোজো কোনওরকমে খেল দুটো ফুচকা, সন্তু খেল দশটা।

মুখটুখ মুছে জোজো বলল, "এবার আমি একটা সিগারেট খাব!"

সন্তু ভুরু কুঁচকে বলল, "সিগারেট? তুই খাস নাকি?"

জোজো বলল, "খাইনি কখনও। পরীক্ষা শেষ হলে খেতে হয়। তুই খাবি না?"

সন্তু বলল, "না! আমার গন্ধটা ভাল লাগে না।"

জোজো চোখ নাচিয়ে বলল, "গন্ধটা ভাল লাগে না? নাকি ভয় পাচ্ছিস? বাড়িতে বকবে। মুখে গন্ধ পাবে।"

সন্তু বলল, "ভয়ের কী আছে? আমার বাবা একসময় খুব সিগারেট খেতেন, এখন অবশ্য ছেড়ে দিয়েছেন। কাকাবাবুও তো আগে চুরুট খেতেন খুব। ঠিক আছে, চল, একটা টেনে দেখি।"

জোজো একটা দোকান থেকে দুটো সিগারেট কিনল। দোকানদারের কাছ থেকেই চেয়ে আনল দেশলাই।

প্রথম সিগারেট ধরানো মোটেই সহজ নয়। সাত-আটটা কাঠি খরচ করে ফেলল জোজো। ধোঁয়া বেরোতেই টান মারল দুই বন্ধু।

দু'বার টানার পরই দু'জনেই কাশতে লাগল খকখক করে।

আর-একবার টেনে সন্তু অর্ধেক সিগারেটটা ছুড়ে ফেলে দিয়ে বলল,

"ধুত, আমার পোষাবে না। লোকে কেন খায় এটা এত কষ্ট করে?"

জোজোও আর টানতে পারল না। সে-ও ফেলে দিল। তবু বীরের মতো বলল, "আমি পরে আবার প্র্যাকটিস করব। বড় আর্টিস্ট হতে গেলে ঠোঁটে সিগারেট ঝুলিয়ে রাখতে হয়। ফোটোয় দেখিসনি?"

সন্তু বলল, "তা হলে তোকে দাড়িও রাখতে হবে।"

জোজো বলল, "তা তো রাখবই। নতুন স্টাইলের দাড়ি। ফ্রেঞ্চকাটও নয়, রবীন্দ্রনাথের মতোও নয়।"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "এখন আমরা কী করব?"

জোজো বলল, "দেখলি, মনুমেন্টে চড়ব বলেছিলুম, ঠিক চড়া হয়ে গেল!"

সন্তু বলল, "সত্যি, তুই পারিসও বটে! রাজ্যপালের সঙ্গে দিব্যি ভাব জমিয়ে ফেললি?"

জোজো বলল, "চল, এবার খিদিরপুরে যাব। ওই যে কয়েকটা জাহাজ দেখা গেল, ওর মধ্যে একটা ফরেন জাহাজের ক্যাপ্টেনকে বলব, আমাদের আফ্রিকা পৌঁছে দিতে।"

সন্তু বলল, "পাগল নাকি? বিদেশি জাহাজের ক্যাপ্টেনকে বললেই আমাদের নিয়ে যাবে? টিকিটের পয়সা লাগবে না?"

জোজো বলল, "তুই কিচ্ছু জানিস না। আজকাল এইসব জাহাজে যাত্রী নেয়ই না। শুধু মালপত্র নিয়ে যায়। আমরা যাব ক্যাপ্টেনের গেস্ট হয়ে। সুতরাং টিকিট লাগার প্রশ্নই নেই। তুই নানাবতীর নাম শুনেছিস?"

সন্তু দু'দিকে মাথা নাড়ল।

জোজো বলল, "আর পি নানাবতী আমার কাকার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। আমরা ডাকতাম 'নানুকাকু'। উনি ছিলেন ইন্ডিয়ান নেভির চিফ। পৃথিবীর সমস্ত জাহাজের ক্যাপ্টেন ওঁর নাম জানেন আর খুব সম্মান করেন। আমি গিয়ে নানুকাকুর নাম বলব, আর দেখবি ক্যাপ্টেনরা আমাদের কত খাতির করবেন।"

সন্তু বলল, "আজ থাক। আমি এখন বাড়ি যাই।"

জোজো এক ধমক দিয়ে বলল, "ধ্যাত! এখন সন্ধেও হয়নি, তুই এর মধ্যেই বাড়ি বাড়ি করছিস? পরীক্ষার শেষদিনে রাত আটটার আগে বাড়ি ফেরার নিয়ম নেই। বাড়ির লোকরাই এখন আমাদের ফিরতে দেখলে অবাক হয়ে যাবেন। আটটার জায়গায় ন'টায় ফিরলে ক্ষতি নেই!"

সন্তু বলল, "আজই আফ্রিকায় গেলে আটটা-ন'টার মধ্যে ফিরব কী করে?"

জোজো বলল, "যদি জাহাজ পাওয়া যায়, তা হলে আর ফিরবই না। বাড়িতেও কোনও খবর দেব না। বাড়ির লোক চিন্তা করবেন ভাবছিস তো? চিন্তা করুন না। মাঝে মাঝে চিন্তা ভাল। আমরা জাহাজে ভেসে পড়ব, বাড়ির লোক ব্যস্ত হয়ে থানায় খবর দেবেন, হাসপাতালে ছুটবেন। কোথাও আমাদের পাত্তা না পেয়ে কাঁদতে শুরু করবেন। আমরা কাল ভোরে মাঝসমুদ্র থেকে ফোনে আমাদের খবর জানিয়ে দেব। আজকাল টেলিফোনের কতরকম সুবিধে হয়ে গিয়েছে। মাউন্ট এভারেস্টের চূড়া থেকেও ফোন করা যায়। তারপর কাকাবাবুর কাছে পৌঁছে গেলে তো আর কোনও কথাই নেই। সে খবর জানার পর বাড়ির লোকদের কান্না একেবারে থেমে গিয়ে মুখে হাসি ফুটবে। আমরা পিকচার পোস্টকার্ড পাঠাব।"

সন্তুর সারামুখে হাসি ঝলমল করছে।

জোজো অবাক হয়ে বলল, "হাসছিস যে বড়? আমার কথা বিশ্বাস হচ্ছে না? চল, খিদিরপুরে চল, দেখিয়ে দিচ্ছি, আমার কথা মেলে কি না।"

সন্তু বলল, "মিলতে তো পারেই তোর কথা। আমি বলি কী, খিদিরপুরে যাওয়ার আগে এদিককার গঙ্গার ঘাটে আগে যাই। ফেরিঘাটে একটা স্টিমারে চড়ে কিছুক্ষণ ঘুরে নিই। সমুদ্রে যাওয়ার আগে একবার গঙ্গায় ঘুরে বেড়ানো ভাল নয়?

॥ ৫ ॥

পরের দিনের কাগজেও অনেকখানি লেখা বেরিয়েছে লোহিয়া সম্পর্কে। এখনও তাঁর কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি, কেউ তাঁর জন্য মুক্তিপণও দাবি করেনি। পুলিশ সব জায়গায় তাঁর খোঁজ করছে। এর মধ্যে একজন লোক নিজের নাম না জানিয়ে পুলিশের বড়কর্তাকে একটা ফোন করেছিল। সে জানিয়েছে যে, সে বিখ্যাত ব্যবসায়ী লোহিয়াকে দেখতে পেয়েছে মোম্বাসা শহরে। সেখানে একটা পার্কের বেঞ্চিতে তিনি চুপ করে বসে ছিলেন। তাঁর পরনে ছিল একটা ধূপের ধোঁয়া রঙের গলাবন্ধ কোট আর সাদা রঙের প্যান্ট। এই লোকটি লোহিয়ার সঙ্গে কথা বলতে গিয়েছিল, কিন্তু লোহিয়া কোনও

উত্তর না দিয়ে উঠে চলে যান। আর তাঁকে দেখা যায়নি।

পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে মোম্বাসায় খবর পাঠিয়ে সেখানকার পুলিশ দিয়ে অনেক তল্লাশি করে। কিন্তু কোনও চিহ্নই পাওয়া যায়নি। সেখানকার পুলিশের ধারণা, যে-লোকটি ফোন করেছিল, সে একটা ধাপ্পা দিয়েছে। নিশ্চয়ই তার কোনও মতলব আছে।

কাকাবাবু ব্রেকফাস্ট টেবিলে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব খবর পড়লেন।

অরুণকান্তির আগেই কাগজ পড়া হয়ে গিয়েছে। তিনি বললেন, "লোহিয়াজি হঠাৎ মোম্বাসা চলে যাবেন কেন? তাঁর অমন প্রিয় বাড়ি, সেখানে আগুন লাগলে তিনি তো তাঁর খুব দরকারি জিনিসপত্র উদ্ধার করারই চেষ্টা করবেন। ওই অবস্থায় বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার তো কোনও কারণই নেই।"

কাকাবাবু বললেন, "তা তো ঠিকই। ওই সময় কোথাও চলে যাওয়াটা মোটেই স্বাভাবিক নয়।"

অরুণকান্তি আবার বললেন, "লোহিয়াজি বাড়িতে আগুন লাগার চেয়েও আরও বড় কোনও বিপদের গন্ধ পেয়েছিলেন। তাই আত্মগোপন করেছেন।"

কাকাবাবু বললেন, "সেটাও হতে পারে। সেটাই বোধহয় ওঁর লুকিয়ে থাকার আসল কারণ।"

অরুণকান্তি এবার খানিকটা ক্ষুব্ধভাবে বললেন, "কী ব্যাপার, বলুন তো কাকাবাবু? আমি যা বলছি, তাতেই আপনি সায় দিয়ে যাচ্ছেন? আপনি কি আমার কথা ভাল করে শুনছেন না? এই ব্যাপারটা নিয়ে আপনি কি নিজে কিছু ভাবছেন না?"

কাকাবাবু বললেন, "না না, শুনব না কেন? তোমার সব কথা শুনছি। তুমি তো ঠিক কথাই বলছ। আমি আর কিছু ভেবে পাচ্ছি না।"

অরুণকান্তি বললেন, "পুলিশের কাছে যে লোকটা ফোন করেছিল, ওরকম কিছু কিছু লোক থাকে, কিছু একটা ঘটনা ঘটলেই বানিয়ে বানিয়ে নানান কথা বলে। ওতেই ওদের আনন্দ। অনেক সময় পুলিশ ওদের কথা শুনে ভুল পথে চলে যায়। তাতে অনেক সময় নষ্ট হয়।"

কাকাবাবু বললেন, "তবে, ওই লোকটি লোহিয়াজির পোশাকের যা বর্ণনা দিয়েছে, তা কিন্তু মিলে যায়। আমি সব সময় লোহিয়াজিকে একটা হালকা রঙের কোট আর সাদা প্যান্ট পরে থাকতেই দেখেছি। অত ধনী মানুষ, কিন্তু সাজপোশাকের কোনও বাড়াবাড়ি ছিল না।"

"তা হলে আপনি কি মনে করেন লোহিয়াজি মোম্বাসা শহরেই গিয়েছেন কোনও কারণে?"

"সেটাও তো নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। যে লোকটি ফোন করেছিল, সে হয়তো লোহিয়াজিকে চেনে, কিন্তু পার্কে দেখা হওয়াটা সত্যি না-ও হতে পারে।"

"কাকাবাবু, আপনি এখন কী করবেন?"

"দু'-একদিন অপেক্ষা করে দেখি, লোহিয়াজির কোনও খোঁজ পাওয়া যায় কি না। যদি নাই-ই পাওয়া যায়, তা হলে, তা হলে আর শুধু শুধু বসে থেকে কী করব? বাড়ি ফিরে যাব!"

"আপনি নিজে থেকে ওঁকে খোঁজার কোনও চেষ্টা করবেন না?"

"আমি কী চেষ্টা করব বলো তো? এটা আমার দেশ নয়। বিশেষত, লোকজনদের চিনি না। কোনও লোক উধাও হয়ে গেলে তাকে খুঁজে বের করার দায়িত্ব পুলিশের। এর মধ্যে আমি নাক গলাতে গেলে এ দেশের পুলিশ তা সহ্য করবে কেন?"

"এ দেশের পুলিশের উপর আমার তেমন ভরসা নেই। লোহিয়াজি লোকটি বড় ভাল। এখানকার ইন্ডিয়ানদের অনেক সাহায্য করতেন।"

কাকাবাবু অন্যমনস্কভাবে বললেন, "হুঁ।"

ব্রেকফাস্ট শেষ করার পরে অরুণকান্তি বললেন, "আমাকে একবার অফিসে যেতে হবে। বেশিক্ষণ থাকব না। তারপর বিকেলে চলুন, বিনায়ক ঘোষদের বাড়িতে যাই। উনি ফোন করেছিলেন।"

কাকাবাবু অন্যমনস্কভাবেই জিজ্ঞেস করলেন, "বিনায়ক ঘোষ কে বলো তো?"

অরুণকান্তি বললেন, "ওই যে প্লেনে দেখা হয়েছিল, এক মহিলার কোলে বাচ্চা ছিল। আপনি তার গান শুনতে চাইলেন?"

কাকাবাবু বললেন, "ও, হ্যাঁ হ্যাঁ। তা হলে চলো, বিকেলে তো কোনও কাজ নেই, ওখানে গিয়ে গান শোনা যাক। তুমি ঘুরে এসো অফিস থেকে।"

অরুণকান্তি উপরে গিয়ে পোশাক পালটে যখন নেমে এলেন, তখনও কাকাবাবু চোখের সামনে খবরের কাগজ মেলে বসে আছেন। তাঁর দৃষ্টি দেখলেই বোঝা যায়, কাগজটা সামনে রয়েছে বটে, কিন্তু তিনি পড়ছেন না।

অরুণকান্তি বললেন, "স্যার। আমার সত্যি খুব অবাক লাগছে। আপনার

সম্পর্কে এত কিছু শুনেছি, অথচ এখানে শুধু চুপচাপ বসে আছেন, এটা যেন ভাবাই যাচ্ছে না!"

কাকাবাবু হেসে বললেন, "চুপচাপ বসে না থেকে তা হলে কি আমি লাফালাফি করব? এই পা নিয়ে তা পারি না যে! তা ছাড়া তুমি আমার সম্পর্কে যা শুনেছ, তা বেশি বেশি শুনেছ। লোকে বাড়িয়ে বাড়িয়ে বলে।"

অরুণকান্তি বললেন, "বাড়িয়ে বলবে কী, আমি নিজের চোখেই তো দেখলাম। হাইজ্যাকারদের হাতে অমন সব মারাত্মক অস্ত্র, আমরা ভয়ে সিঁটিয়ে আছি, আর আপনি তাদের এক ঘুসি মেরে ঠান্ডা করে দিলেন। সব ক'টা ধরা পড়ে গেল!"

কাকাবাবু আরও জোরে হেসে উঠে বললেন, "আরে, আমি কি ওদের প্ল্যান করে ধরিয়ে দিয়েছি? অত সাহস আমার নেই। আজকাল আমার রাগটা বড্ড বেড়ে গিয়েছে। ওদের একটা ছেলে অকারণে আমাকে অপমান করছিল, আমার গোঁফ ধরে টানল, তাতেই আমার মাথা এত গরম হয়ে গেল যে, পরে কী হবে না-হবে তা না ভেবেই মেরে দিলাম এক ঘুসি। আসলে ওই ছেলেগুলোই একেবারে নভিস, ভাল করে ট্রেনিং নেয়নি, তাই অত সহজে ধরা পড়ে গেল। এতে আমার কোনও কৃতিত্ব নেই।"

অরুণকান্তি বললেন, "সে আমরা ঠিক বুঝে নিয়েছি। যাই হোক, আপনি টিভি দেখুন, আমি অফিস থেকে ঘুরে আসছি।"

কাকাবাবুর টিভি দেখার বিশেষ অভ্যেস নেই। তিনি মহাভারত খুলে বসলেন। কৃষ্ণ ফিরে গিয়েছেন পাণ্ডবদের কাছে। এবার যুদ্ধ লাগবে।

কতবার পড়ছেন এই বই, তবু কিছুদিন অন্তর অন্তর পড়তে ভাল লাগে।

দুপুরে একবার ফোন করলেন কলকাতার বাড়িতে।

সন্তু নেই, বন্ধুদের সঙ্গে বেরিয়েছে। পরীক্ষা হয়ে গিয়েছে, এখন তো কয়েকটা দিন আড্ডা মারবেই। বউদির সঙ্গে খানিকক্ষণ গল্প করলেন কাকাবাবু।

বিকেলের দিকে অরুণকান্তি ফিরে এসে কাকাবাবুকে নিয়ে বেরোলেন।

এখানে সন্ধের আগের রোদটাকে ঠিক সোনালি মনে হয়। আকাশ একেবারে তকতকে নীল। রাস্তার পাশে পাশে মাঝে মাঝেই দেখা যাচ্ছে একটা ফুলের গাছ, খুব সম্ভবত কাঞ্চন ফুল।

গতকাল সারাদিনই শহরের নানান জায়গায় দেখা গিয়েছে লোহিয়াজির নিজস্ব চিড়িয়াখানার ছাড়া পাওয়া জন্তু-জানোয়ার। এখানকার লোকরা

বন্যপ্রাণী দেখতে খুবই অভ্যস্ত, তাই কেউ কিছু গ্রাহ্য করেনি। শুধু এক জায়গায় একটি বাচ্চা ছেলে হাতি দেখে ভয় পেয়ে পালাতে গিয়ে নর্দমায় পড়ে গিয়েছিল, আর কোনও ক্ষতি হয়নি কারও।

এর মধ্যে সেই জানোয়াররা শহর ছেড়ে চলে গিয়েছে নিশ্চয়ই। তবে জেব্রা দেখা যায় যে-কোনও জায়গায়। আমাদের দেশের গাধার মতো। গাধা আর জেব্রা তো প্রায় একই প্রাণী, তবে গাধার গায়ের রং দেখতে ভাল নয়, আর মুখখানা বোকা বোকা। জেব্রাদের গা ডোরাকাটা বলে বেশ সুন্দর দেখায়। গাধার বদলে শুধু জেব্রাদের গা-ই কেন ডোরাকাটা? শুধু তাই-ই নয়, গায়ের ওই ডোরাকাটাগুলো নাকি প্রত্যেক জেব্রার আলাদা!

হেমন্তিকা আর বিনায়ক ঘোষদের বাড়িও নিরিবিলি এলাকায়। আলাদা বাড়ি নয় অবশ্য, তিনতলার উপরে ফ্ল্যাট। স্বামী-স্ত্রী দু'জনেরই বয়স বেশি নয়, ত্রিশ-বত্রিশের মধ্যে। বেশিদিন আগে আসেননি এদেশে। পাঁচ বছর। বিনায়ক এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, হেমন্তিকাও একটা লাইব্রেরিতে চাকরি করতেন। ছোট বাচ্চা আছে বলে এখন চাকরি ছেড়ে বাড়িতেই থাকেন।

ফ্ল্যাটটি বেশ বড়। বসবার ঘরে এক দেওয়ালে রবীন্দ্রনাথের বিরাট ছবি, অন্য দেওয়ালে নজরুলের। নজরুলের ছবিটা অন্যরকম, ধুতি ও হলুদ পাঞ্জাবি পরা পুরো চেহারা। কাকাবাবু খুব কাছে গিয়ে দেখলেন, ফোটোগ্রাফ বলে মনে হলেও আসলে সেটা আঁকা ছবি।

চা খেতে খেতে শুরু হয়ে গেল সেই প্লেন হাইজ্যাকের গল্প। হেমন্তিকা চোখ বড় বড় করে বলতে লাগলেন, "উঃ বাবা, ভাবলেও এখনও গায়ে কাঁটা দেয়। এক ভদ্রলোকের গলায় ফাঁস জড়িয়ে কীরকম অত্যাচার করল?"

একটু পরে কাকাবাবু বললেন, "ও গল্প থাক। হেমন্তিকা, তোমার গান শোনাবার কথা ছিল?"

আগে থেকেই একটা হারমোনিয়াম এনে রাখা হয়েছে।

হেমন্তিকা তাঁর সামনে বসে পড়ে বললেন, "আপনি যে বললেন, রবীন্দ্রনাথ নাইরোবি নিয়ে গান লিখেছিলেন, সেটা তো খুঁজে পেলাম না!"

কাকাবাবু বললেন, "রবীন্দ্রনাথ নাইরোবি নিয়ে গান লিখেছেন, তা বলিনি। বলেছিলাম, রবীন্দ্রনাথের গানে 'নাই রবি' আছে। তুমি এই গানটা জানো, 'সকালবেলার আলোয় বাজে, বিদায় বেলার ভৈরবী'?"

হেমন্তিকা বললেন, "শুনেছি, পুরোটা জানি না।"

কাকাবাবু বললেন, "পুরো গানটা হচ্ছে:

'সকালবেলার আলোয় বাজে
বিদায় বেলার ভৈরবী—
আন্ বাঁশি তোর, আয় কবি ॥
শিশিরশিহর শরৎপ্রাতে শিউলিফুলের গন্ধ সাথে
গান গেয়ে যাস আকুল হাওয়ায়,
নাই যদি রোস নাই র'বি।' "

কাকাবাবু শেষ লাইনটা বলতেই সবাই হেসে উঠলেন।

অরুণকান্তি বললেন, "নাইরোবি তো নয়। এর তো অন্য মানে। 'নাই যদি রোস নাই র'বি', এর মানে হচ্ছে, থামতে না চাস, তা হলে থামিস না।"

কাকাবাবু হেসে বললেন, "সে যাই হোক, যখন সবাই এ গানটা গায়, তখন উচ্চারণ করে নাইরোবি!"

বিনায়ক বললেন, "কেনিয়া কিংবা নাইরোবি নিয়ে বাংলায় কি কোনও বই আছে?"

অরুণকান্তি বললেন, "আমার তো কখনও চোখে পড়েনি।"

কাকাবাবু বললেন, "আমি একটা বই পড়েছিলাম, সে বইটা এখন পাওয়া যায় কি না জানি না। বইটার নাম, 'নাইরোবি থেকে রবি'।"

হেমন্তিকা বললেন, "এ আবার কী নাম? এর কোনও মানে আছে?"

কাকাবাবু বললেন, "লেখকের নাম খুব সম্ভবত শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ। ভদ্রলোক অনেকদিন আগে এই নাইরোবিতেই থাকতেন। সেকালের অনেক বর্ণনা দিয়েছেন। তখন এই শহরটাই নতুন হয়েছে বলা যায়।"

অরুণকান্তি বললেন, "কেনিয়া দেশটাই তো নতুন। আগে নানা জাতের লোক থাকত, কিন্তু দেশ যাকে বলে, ইংরেজরা এসে সেটা বানিয়েছে। ওরাই একটা পাহাড়ের নাম নিয়ে দেশটার নাম দেয় কেনিয়া।"

কাকাবাবু বললেন, "সেই বইয়ের প্রথম অংশে দারুণ সব কাহিনি আছে, তার মধ্যে বাড়িতে সিংহ ঢুকে পড়ার কথাও মনে আছে। তারপর সেই ভদ্রলোক একসময় দেশে ফিরে যাওয়ার কথা ঠিক করলেন। কলকাতায় গিয়ে আস্তে আস্তে তাঁর কিছু লেখকের সঙ্গে বন্ধুত্ব হল। কলকাতা থেকে একদিন শান্তিনিকেতনে গিয়ে সেখানেই থেকে যেতে চাইলেন। রবীন্দ্রনাথ

তখনও বেঁচে ছিলেন, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেও তাঁর দেখা হল। সেই জন্য বইয়ের নাম 'নাইরোবি থেকে রবি'।"

বিনায়ক বললেন, "বইটা জোগাড় করার চেষ্টা করব তো!"

কাকাবাবু হেমন্তিকার দিকে তাকিয়ে বললেন, "তোমার নামেও তো রবীন্দ্রনাথের গান আছে। তুমি সেই গানটা জানো নিশ্চয়ই?"

হেমন্তিকা ঘাড় হেলিয়ে বললেন, "জানি!"

কাকাবাবু বললেন, "সেটাই আগে শোনাও!"

তিনি গাইলেন :

"হিমের রাতের ওই গগনের দীপগুলিরে
হেমন্তিকা করল গোপন আঁচল ঘিরে।
ঘরে ঘরে ডাক পাঠালো—
দীপালিকায় জ্বালাও আলো
জ্বালাও আলো, আপন আলো..."

মেয়েটি বেশ ভালই গান করেন! কাকাবাবু মুগ্ধ হয়ে শুনে বললেন, "চমৎকার। তুমি আরও একটা গাও!"

বিনায়ক জিজ্ঞেস করলেন, "কাকাবাবু, আপনিও নিশ্চয়ই গান জানেন?"

কাকাবাবু বললেন, "না না, একদম না। আমি অনেক গান মুখস্ত বলতে পারি। কিন্তু গাইতে পারি না। তাই আমি বাথরুম সিঙ্গার।"

হেমন্তিকা বললেন, "আপনার নাম রাজা রায়চৌধুরী। রাজাকে নিয়েও তো রবীন্দ্রনাথের অনেক গান আছে। সেরকম একটা...!"

কাকাবাবু বললেন, "আমার নাম নয়, শুধু 'রাজা' বা 'মহারাজ' নিয়ে অনেক গান আছে ঠিকই। কিন্তু সেসব গাইতে হবে না। তুমি এই গানটা গাও: 'আলো আমার আলো ওগো, আলো ভুবন ভরা!' "

সে গান সবেমাত্র শুরু হতেই সামনের রাস্তায় একটা দারুণ হইহই চিৎকার শোনা গেল।

প্রথমে বিনায়ক উঠে গিয়ে উঁকি দিলেন সামনের বারান্দায়।

সেখানে গিয়ে তিনিও চেঁচিয়ে উঠলেন, "অ্যাই, অ্যাই!"

তারপর "ও, মাই গড," বলতে বলতে তিনিও সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলেন দুপদুপিয়ে।

একত্রে সবাই দৌড়ে গেলেন বারান্দায়। দেখা গেল একটা অদ্ভুত দৃশ্য।

সামনের রাস্তায় খেলা করছিল আট-দশটি বাচ্চা ছেলেমেয়ে। ফুটপাথ ঘেঁষে পার্ক করানো আছে তিনটি গাড়ি।

কয়েকটা লোকের মুখে কালো মুখোশ, তারা সেই তিনটি গাড়িরই দরজা খুলে ভিতরে ঢুকছে। বাচ্চারা চ্যাঁচাচ্ছে। কয়েকটি ফ্ল্যাটের বারান্দা থেকে কিছু লোকও চ্যাঁচামেচি করছে, মুখোশধারীরা গ্রাহ্যই করছে না।

বিনায়ক নীচে যেতে যেতেই গাড়ি তিনটি স্টার্ট নিয়ে বেরিয়ে গেল। বিনায়ক শুধু শুধু একটা গাড়ির পিছনে কিছুটা দৌড়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন এক জায়গায়।

হেমন্তিকা বললেন, "দেখলেন, দেখলেন! এখনও তেমন অন্ধকার হয়নি, এ একেবারে দিনের আলোয় ডাকাতি। ইস, গাড়িটা ওর খুব ফেভারিট ছিল।"

অরুণকান্তি ম্লান হেসে বললেন, "আমার গাড়িটাও তো নিয়ে গেল। ওটা অবশ্য আমার নিজস্ব নয়, অফিসের গাড়ি।"

হেমন্তিকা বললেন, "একসঙ্গে তিনটে গাড়ি চুরির ঘটনা আমি আগে কখনও শুনিনি। তাও এত লোকের চোখের সামনে।"

কাকাবাবু বললেন, "বাচ্চারা ওখানে খেলছে। আমার ভয় করছিল, ওরা গাড়ি নিয়ে হুড়োহুড়ি করে পালাতে গিয়ে কাউকে না চাপা দেয়!"

অরুণকান্তি বললেন, "গাড়ি চুরি এখানে খুব সাধারণ ঘটনা। এখানে এমন কেউ নেই, যার একটা না-একটা গাড়ি চুরি হয়নি। আজ ইংল্যান্ডের একজন মন্ত্রী এ দেশ সফরে আসছেন। কোনও ভি আই পি এলে সেইসব দিনে কয়েকটা রাস্তা পুলিশে পুলিশে একেবারে ছয়লাপ হয়ে যায়। অন্য অনেক রাস্তায় পুলিশ থাকেই না। এইসব দিনে গাড়ি চোরদের দারুণ মজা। ওরা জানে, এইসব রাস্তায় আজ হাজার ডাকলেও পুলিশ আসবে না।"

হেমন্তিকা বললেন, "পুলিশ থাকলেই বা কী হয়? অনেক সময় এরা চুরি করে, পুলিশ অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে থাকে। এই দেশটা এমনিতে এত ভাল, এত সুন্দর, খাবারদাবারও ভাল পাওয়া যায়, কিন্তু বড্ড চোর-ডাকাতের উৎপাত। সব সময় কাঁটা হয়ে থাকতে হয়।"

বিনায়ক উপরে ফিরে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, "আনবিলিভেব্‌ল। এত লোকের চোখের সামনে দিয়ে গাড়ি তিনটে নিয়ে গেল? আমার গাড়িটা এত পছন্দের, এত ভাল পিক্‌আপ, জোরে ব্রেক কষলেও বিচ্ছিরি শব্দ হয় না!"

কাকাবাবু বললেন, "গাড়ির ইনশিয়োরেন্স আছে নিশ্চয়ই?"

বিনায়ক বললেন, "তা আছে! কিছু টাকা দেবে। কিন্তু এই গাড়ি তো আর ফিরে পাব না?"

এর পর আর গান জমে না। চেনাশুনো আর কার বাড়িতে কবে কেমন রোমহর্ষক ডাকাতি হয়েছে, সেই গল্পই চলতে লাগল।

হেমন্তিকা অনেক রকম রান্নাবান্না করে রেখেছেন। কিন্তু গাড়ির শোকে কারও বিশেষ কিছু খেতে ইচ্ছে করল না। কাকাবাবু এমনিতেই রাত্তিরবেলা খুব কম খান।

ট্যাক্সি নিয়ে ফিরতে হবে, তাড়াতাড়ি ফেরা দরকার। আজকের রাতটা সাবধানে থাকতে হবে। পুলিশরা সব ইংরেজ মন্ত্রীকে নিয়ে ব্যস্ত, চোর-ডাকাতরা বাড়িতেও হানা দিতে পারে।

অরুণকান্তি বাড়ির সামনে ট্যাক্সিটা ছেড়ে দেওয়ার পর দেখা গেল, কাছেই একটা পুলিশের গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে।

অরুণকান্তি বললেন, "নিশ্চয়ই এ পাড়ায় কোনও ভি আই পি কিংবা কোনও মন্ত্রীর আত্মীয় এসেছে, তাই পুলিশ এসে পাহারা দিচ্ছে। যাক বাঁচা গেল, আমরাও নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারব!"

ভিতরে এসে অরুণকান্তি বললেন, "আমি আজ একটু তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ব ভাবছি। কাল সকাল সাড়ে আটটায় আমার অফিসে একটা মিটিং আছে। আমি দুপুর বেলাতেই ফিরে আসবার চেষ্টা করব। তারপর আমরা বেড়াতে যেতে পারি কোথাও!"

কাকাবাবু বললেন, "হ্যাঁ হ্যাঁ, তুমি গিয়ে শুয়ে পড়ো!"

অরুণকান্তি উপরে চলে যাওয়ার পরেই কাকাবাবু ভাবলেন, এবার কলকাতাতেই ফিরে যাওয়া উচিত। অরুণকান্তির অফিসের বেশ চাপ আছে, বোঝাই যাচ্ছে। তারই মধ্যে মধ্যে ছুটি নিয়ে সে আর কত তাঁকে নিয়ে ঘুরবে? তা ছাড়া বেড়াবারও মন নেই কাকাবাবুর। তিনি যে উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছিলেন, সেটার আর কিছুই করা যাবে না।

কালকেই প্লেনের টিকিটটা বদলাতে হবে।

এক্ষুনি দরকার নেই, তবু কাকাবাবু হ্যান্ডব্যাগে টিকিটটা খুঁজতে লাগলেন। প্রথমেই পেয়ে গেলেন একটা লম্বা খামের চিঠি। লোহিয়াজির লেখা। এই চিঠির উপর নির্ভর করেই তিনি এ দেশে এসেছেন।

এই সময় বেজে উঠল বাইরের দরজার বেল।

এ দেশে রাত্রের দিকে কেউ তো আসে না। টেলিফোন না করে হঠাৎ কারও উপস্থিত হওয়ার কোনও রেওয়াজই নেই। আমাদের দেশের মতো বিনা কারণে আড্ডা দিতে এরা জানেই না।

দরজা খোলারও কেউ নেই। এখানে কাজের লোকের ডিউটি আওয়ার্স আছে। সন্ধের সময় ঠিক সাতটা বাজলেই এরা চলে যায়। যে রান্না করে, সে টেবিলের উপর রেখে যায় খাবারদাবার। নিজেদের গরম করে নিতে হয়।

অরুণকান্তি উপর থেকে নামবার আগেই কাকাবাবু নিজেই গিয়ে দরজা খুলে দিলেন।

বাইরে দাঁড়িয়ে আছে পুরোদস্তুর পোশাক পরা দু'জন পুলিশ অফিসার। তাদের একজন পরিষ্কার ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করল, "এ বাড়িতে কি রাজা রায়চৌধুরী নামে কেউ থাকেন?"

কাকাবাবু বললেন, "হ্যাঁ, আমিই।"

পুলিশটি আবার জিজ্ঞেস করল, "আপনি ইন্ডিয়া থেকে আসছেন?"

কাকাবাবু বললেন, "ইয়েস।"

পুলিশটি বুকপকেট থেকে একটা ফোটোগ্রাফ বের করে কাকাবাবুর চেহারার সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে লাগল।

কাকাবাবু এবার একটু অবাক হলেন।

পুলিশটি তাঁর ফোটো পেল কোথা থেকে? এ ফোটোটা কোথায় তোলা হয়েছে?

পুলিশটি ফোটোটা আবার পকেটে ভরে বলল, "ঠিক আছে। স্যার, আমরা পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স থেকে আসছি। আপনাকে একবার থানায় যেতে হবে।"

কাকাবাবু খুব নিরীহভাবে প্রশ্ন করলেন, "এত রাত্তিরে থানায় যেতে হবে? কেন বলুন তো?"

পুলিশটি বলল, "বেশি তো রাত হয়নি। আমাদের বড়সাহেব আপনার সঙ্গে কিছু কথা বলবেন।"

এর মধ্যে চটি ফটফটিয়ে উপর থেকে নেমে এলেন অরুণকান্তি। ব্যস্তসমস্ত হয়ে বলতে লাগলেন, "কী ব্যাপার, কী ব্যাপার?"

পুলিশই জিজ্ঞেস করল, "স্যার, এটা আপনার বাড়ি? আপনি এখানে কতদিন আছেন?"

অরুণকান্তি নিজের নাম জানিয়ে বললেন, "আমি এদেশে আছি সতেরো

বছর। আমি 'কেনিয়াট্টা পেপার ওয়ার্কস' নামে একটা কোম্পানির জেনারেল ম্যানেজার। আপনারা এই কোম্পানির নাম শুনেছেন নিশ্চয়ই। জেমো কেনিয়াট্টা নিজে এই কোম্পানির প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছেন।"

জেমো কেনিয়াট্টা ছিলেন স্বাধীনতাসংগ্রামী বীর, এ দেশ স্বাধীন হওয়ার পর প্রথম রাষ্ট্রপতি। তাঁর নাম শুনলেই সবাই শ্রদ্ধা প্রকাশ করে।

পুলিশটি অবশ্য সেরকম কোনও ভাব দেখাল না। গম্ভীরভাবে বলল, "এই ভদ্রলোক আপনার গেস্ট? এঁকে একবার থানায় যেতে হবে।"

অরুণকান্তিও কাকাবাবুর মতো একই প্রশ্ন করলেন, "এত রাত্রে থানায় যেতে হবে কেন?"

পুলিশটি বলল, "আমাদের বড়সাহেব এঁর সঙ্গে কথা বলতে চান।"

অরুণকান্তি বললেন, "সকালবেলা কথা বলা যায় না? কী এমন জরুরি কথা আছে?"

পুলিশটি এবার কঠোরভাবে বলল, "আমার উপর যা অর্ডার আছে, আমি তাই-ই পালন করতে এসেছি। শুধু শুধু দেরি করে লাভ নেই।"

অরুণকান্তি কাকাবাবুকে বাংলায় বললেন, "এদের সঙ্গে তর্ক করে লাভ নেই। এরা বড্ড গোঁয়ার হয়।" তারপর তিনি পুলিশটিকে বললেন, "ঠিক আছে, একটু অপেক্ষা করুন। আমি তৈরি হয়ে আসছি। আমিও সঙ্গে যাব।"

পুলিশটি বলল, "না, সেরকম অর্ডার নেই। ওঁকে একাই নিয়ে যেতে হবে।"

অরুণকান্তি জিজ্ঞেস করলেন, "উনি ফিরবেন কী করে? উনি এখানকার রাস্তাঘাট কিছুই চেনেন না।"

পুলিশটি এবার একটু নরম হয়ে বলল, "আপনি চিন্তা করছেন কেন? বেশিক্ষণ লাগবে না। আমাদের গাড়িই পৌঁছে দিয়ে যাবে। চলুন, চলুন!"

কাকাবাবু অরুণকান্তিকে বললেন, "তুমি চিন্তা কোরো না, এরা তো আমাকে পৌঁছে দেবে বলেছে।"

বাইরে বেরিয়ে গাড়িতে ওঠার পর সেই পুলিশটি বসল সামনে। আর-একজন বন্দুকধারী পুলিশ এসে বসল কাকাবাবুর পাশে। সারা রাস্তায় কেউ কোনও কথা বলল না।

পুলিশস্টেশনে পৌঁছোবার পর সামনের দিকে কয়েকটি ঘর পেরিয়ে ভিতরের দিকের একটা ছোট ঘরে এসে সেই পুলিশ অফিসারটি একটি চেয়ারে বসল। সে ঘরে আর কোনও চেয়ার নেই। শুধু একটা টুল রয়েছে।

সেটা দেখিয়ে পুলিশটি বলল, "বসুন ওখানে!"

কাকাবাবু বসলেন না, দাঁড়িয়ে রইলেন।

পুলিশটি জিজ্ঞেস করল, "আপনি কিছু খেয়েটেয়ে এসেছেন?"

কাকাবাবু বললেন, "হ্যাঁ। ডিনার খাওয়া হয়ে গিয়েছে।"

পুলিশটি বলল, "গুড! আপনাকে এখন অ্যারেস্ট করা হচ্ছে। রাত্তিরটা আপনাকে গারদে কাটাতে হবে।"

কাকাবাবু দারুণ অবাক হয়ে কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইলেন। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, "অ্যারেস্ট করা হবে মানে? আমি কী দোষ করেছি?"

পুলিশটি এবার টেবিলের উপর দু'পা তুলে দিয়ে বলল, "দোষ? ওসব আমি জানি না। আপনাকে গারদে ঢোকাতে বলা হয়েছে, তাই-ই করছি।"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "আমার নামে অ্যারেস্ট ওয়ারেন্ট আছে?"

পুলিশটি অবহেলার সঙ্গে একটা হাত নাড়তে নাড়তে বলল, "ওসব লাগে না। জরুরি অবস্থায় আমরা যাকে-তাকে ধরতে পারি!"

কাকাবাবু বললেন, "আপনি যে বলেছিলেন, আপনাদের বড়সাহেব আমার সঙ্গে কথা বলতে চান?"

পুলিশটি বলল, "এক্ষুনি শুনলাম, আজ রাত্তিরে তাঁর সময় হবে না। তাঁর যখন মর্জি হবে, তখন কথা বলবেন। কাল হতে পারে, পরশুও হতে পারে।"

কাকাবাবু বললেন, "আমি যাঁর বাড়িতে ছিলাম, তাঁকে একটা খবর দিতে পারি? তা ছাড়া, আমি একজন উকিলও ঠিক করতে চাই!"

লোকটি তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল, "ওসব হবে না। ওসব হবে না। বেশি কথা বলবেন না। আমি বেশি কথা পছন্দ করি না।"

কাকাবাবু এবার একটু গলা চড়িয়ে বললেন, "আমি যদি গারদে যেতে রাজি না হই? আমি কোনও ক্রাইম করিনি। কেন শুধু-শুধু...!"

পুলিশটি টেবিলে প্রচণ্ড জোরে এক চাপড় মেরে বলল, "রাজি না হই মানে? এখান থেকে পালাবেন নাকি? এতক্ষণ গায়ে হাত দিইনি। এবার...!"

কাকাবাবু মাথা নিচু করলেন। মনে মনে বলতে লাগলেন, 'রাজা রায়চৌধুরী, মাথা গরম কোরো না। পুলিশের সঙ্গে রাগারাগি করলে কোনও লাভ হবে না। ওরা মারতে শুরু করলে তুমি বাধা দিতেও পারবে না!'

মাথা তুলে কাকাবাবু বিনীতভাবে বললেন, "না না, পালাবার কথা

উঠছেই না। আমি খোঁড়া লোক। কেন অ্যারেস্ট করা হল সেটাই বোঝার চেষ্টা করছিলাম। ঠিক আছে, আপনি যা বলবেন, তাই-ই শুনব।”

পুলিশটি অন্য একজনকে ডাকল।

সেই লোকটি এসে অকারণেই কাকাবাবুকে প্রায় ধাক্কা মারতে মারতে নিয়ে চলল।

এক জায়গায় কাকাবাবুর পকেট সার্চ করে দেখা হল।

কয়েকশো ডলার আর কিছু কার্ড ছাড়া কিছুই নেই। সেগুলো রেখে দিল লোকটি।

তারপর কাকাবাবুর পোশাক ছাড়িয়ে পরানো হল কয়েদিদের ডোরাকাটা ঢোলা জামা আর পায়জামা।

তারপর একটা লোহার দরজা খুলে কাকাবাবুকে ঠেলে ঢুকিয়ে দেওয়া হল ভিতরে।

ঘরটি বেশ লম্বামতো। এটা ঠিক জেলখানার মতো নয়। থানার গারদে এক ঘরেই অনেকে থাকে।

এই ঘরেও রয়েছে আটজন। বিছানাটিছানা কিছু নেই। সবাই বসে আছে মেঝেতে ছড়িয়ে। কয়েকজনের চেহারা দেখলে রীতিমতো ভয় করে। ঠিক যেন যমদূত। আরও কয়েকজন নিরীহ মতো। একজনকে দেখলেই মনে হয় স্কুলশিক্ষক।

প্রথম কয়েক মুহূর্ত সবাই দেখল কাকাবাবুকে। তিনি কোনওরকমে একটা ফাঁক খুঁজে দেওয়াল ঘেঁষে বসে পড়লেন।

যমদূতের মতন চেহারার একজন হেঁড়ে গলায় জিজ্ঞেস করল, “কী হে, তুমি কোন কেসে এসেছ? খুন, ডাকাতি, রাহাজানি কিংবা ছিঁচকে চুরি?”

কাকাবাবু বললেন, “সেটা আমি ঠিক এখনও জানি না!

সবাই একসঙ্গে হ্যা হ্যা করে হেসে উঠল।

কাকাবাবুও তাদের সঙ্গে হাসিতে যোগ দিলেন। তারপর তিনি বললেন, “হাকুনা মাটাটা। হাকুনা মাটাটা।”

এবার অন্যরা আরও জোরে বলতে লাগল।

॥ ৬ ॥

দুপুর ঠিক একটার সময় কাকাবাবুকে আবার সেই লোহার দরজার বাইরে বের করা হল।

সকালে দেওয়া হয়েছিল একমগ ভরতি কফি আর একটা কোয়ার্টার সাইজ পাউরুটি। কাকাবাবু তাই-ই বেশ তৃপ্তি করে খেয়েছেন। কাকাবাবু যখনই কোনও বিপদের মধ্যে পড়েন, তখনই যে-কোনও খাবার পেলেই খেয়ে নেন। কারণ, পরে আবার কখন কোথায় খাবার পাওয়া যাবে, তার তো ঠিক নেই।

এখানেও তাই হল।

একটার সময় কাকাবাবুর সঙ্গে সঙ্গে অন্য কয়েদিদেরও বের করা হল, দুপুরের আহারের জন্য। বাইরে রয়েছে দু'জন গার্ড, হাতে চাবুক।

আগের রাত্তিরে আর আজ সকালে কাকাবাবু কয়েকজন কয়েদির সঙ্গে বেশ ভাব জমিয়ে নিয়েছেন। এক-একজনের জীবনকাহিনি এক-একরকম। সবাই মোটেই হিংস্র, ভয়ংকর মানুষ নয়। একজন অবশ্য বেশ গর্বের সঙ্গেই বলেছিল, সে পাঁচটা খুন করেছে! কিন্তু ধরা পড়েছে এই প্রথম। খুন করার জন্য তার কোনও অনুতাপ নেই। কারণ, তার মতে, যাদের সে খুন করেছে, তারা হিংস্র পশুরও অধম।

দু'-একজন অবশ্য কোনও কথাই বলতে চায়নি।

যে-কয়েকজনের যমদূতের মতো চেহারা, তাদের একজনের নাম জোসেফ এন। এখানকার অনেক আদিবাসীই খ্রিস্টান হয়, তাই এই ধরনের নাম। ওর বিশাল চেহারা, লাল ড্যাবডেবে দুটো চোখ দেখলে গা ছমছম করে, কিন্তু মানুষটা বেশ নরম। ও ট্রাক চালায়। ওর দুটো ছেলেমেয়ে, নয় আর এগারো বছরের, তাদের ফোটো ও সঙ্গে রাখে। রাস্তায় ওর ট্রাক থামিয়ে বিনা দোষে পুলিশ ঘুষ চেয়েছিল বলে ও দিতে রাজি হয়নি। তখন পুলিশ ওকে মারতে শুরু করে। জোসেফও একটা পুলিশকে ঘুসি মারে। সেইজন্যই অনেক পুলিশ ওকে ঘিরে ধরে মারতে মারতে এনে এই গারদে ভরে দেয়।

লোকটির প্রতি বেশ মায়া পড়ে গেল কাকাবাবুর। সে শুধু তার ছেলেমেয়ের গল্প করে।

তাই কাকাবাবু তাকে বলেছিলেন, "শোনো জোসেফ, তুমি এখানে পুলিশের সঙ্গে আর গন্ডগোলের মধ্যে যেয়ো না। তোমাকে যে-কেসে ধরে

এনেছে তা পেটিকেস, বড়জোর ছ'মাস কিংবা এক বছরের জেল হবে। তা মেনে নিতেই হবে। তোমার আসল কাজ, ছেলেমেয়ে দুটির লেখাপড়ার সবরকম যত্ন নেওয়া। ওরা যদি উকিল-ব্যারিস্টার কিংবা ডাক্তার হয়, তখন দেখবে, পুলিশ তোমাদের উপর আর কোনও অত্যাচার করতে সাহস করবে না।"

জোসেফ তখন কাকাবাবুর সামনে দাঁড়িয়ে ঝুঁকে পড়ে কাকাবাবুর একটা হাতে চুম্বন দিয়ে বলল, "আপনি প্রার্থনা করবেন স্যার, আমার ছেলেমেয়ে দুটি যেন মানুষের মতো মানুষ হয়!"

লোহার দরজার বাইরে এনে অন্যদের নিয়ে যাওয়া হল একদিকে, শুধু কাকাবাবুকে অন্যদিকে। জোসেফ ঘুরে দাঁড়িয়ে কিছু বলতে যাচ্ছিল, কাকাবাবু হাত তুলে বললেন, "ঠিক আছে, ঠিক আছে, পুলিশের সঙ্গে তর্ক কোরো না। আশা করি, আবার দেখা হবে!"

কাকাবাবু ভাবলেন, তাঁকে অন্য কয়েদিদের সঙ্গে নিয়ে যাওয়া হল না, তার মানে, তাঁকে নিশ্চয়ই আলাদা জায়গায় বসিয়ে স্পেশ্যাল খাবার দেওয়া হবে।

আবার তাঁকে এনে বসাল সেই ছোট ঘরটায়। আগের পুলিশটি সেখানে নেই। না থাকলেও পুলিশের চেয়ারে বসা উচিত নয় বলে কাকাবাবু বাধ্য হয়ে টুলটায় বসলেন।

যে তাঁকে নিয়ে এসেছিল, সে কিছু না বলে বেরিয়ে গেল। আর তার দেখা নেই। কাকাবাবু বসে রইলেন তো বসেই রইলেন। খিদেয় তাঁর পেট চুঁইচুঁই করছে।

এমনিতে কাকাবাবু দু'-তিনদিন না খেয়ে কাটিয়ে দিতে পারেন। কিন্তু যদি জানা যায়, অন্য একটি ঘরে বাকি কয়েদিরা খেতে বসে গিয়েছে, আর তাঁকে কেউ কিছু দিচ্ছে না, তাতেই খিদেটা খুব বেড়ে যায়।

একঘণ্টা, দু'ঘণ্টা, তিনঘণ্টা কেটে গেল। খাবারও এল না, কেউ কিছু খবরও দিল না। একেবারে অসহ্য অবস্থা।

কাকাবাবু মেজাজ খারাপ করবেন না ঠিক করে স্থির হয়ে বসে রইলেন। চিন্তা করতে লাগলেন আকাশ-পাতাল। তাঁকে এখানে কেউ চেনে না, তবু কেন এভাবে আটকে রাখা হচ্ছে, সেটাই বুঝতে পারছেন না কিছুতে।

চারটের পর বাইরে সাড়াশব্দ শোনা গেল। এ ঘরে এসে ঢুকল একজন লোক, পুলিশের পোশাক হলেও বুকের দু'দিকে নানারকম ব্যাজ ও মেডেল

আঁটা দেখে বোঝা যায়, বেশ একজন হোমরাচোমরা কেউ হবেন।

তিনি খালি চেয়ারটায় বসে পড়ার পরেই বললেন, "আরে, মি. রাজা রায়চৌধুরীকে একটা টুলে বসিয়ে রাখা হয়েছে? ছি ছি! এরা সব ইডিয়েট। অ্যাই, কে আছিস, শিগ্‌গির একটা চেয়ার নিয়ে আয় ওঁর জন্য।"

চেয়ার আনবার আগেই তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "মি. রায়চৌধুরী, আপনার কোনও অসুবিধে হয়নি তো?"

কাকাবাবু বললেন, "না না। বেশ চমৎকার আরামেই ছিলাম!"

লোকটি বললেন, "আপনি আমাকে চিনবেন না। আমার নাম আলফ্রেড নিন্‌জানে। আমি এখানকার পুলিশের হেড।"

কাকাবাবু বললেন, "আমি আপনাকে চিনি না ঠিকই। আপনি আমাকে চিনলেন কী করে? কিংবা আমাকে চেনেন না, শুধু আমার নামটা জেনেছেন।"

নিন্‌জানে বললেন, "হবে, সেসব কথা পরে হবে। আগে একটু চা কিংবা কফি খাওয়া যাক। আপনি খাবেন তো? কোনটা আপনার পছন্দ?"

কাকাবাবু মনে মনে হাসলেন। দুপুরে কিছু খাওয়াই হল না। এখন চা-কফির প্রস্তাব! তিনি বললেন, "হ্যাঁ, একটু চা পেলে মন্দ হয় না!"

নিন্‌জানে আর কিছু না বলে কাকাবাবুর দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন। একটু পরে একজন দু'কাপ চা দিয়ে যাওয়ার পর নিন্‌জানে উঠে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিলেন, দুটো জানলাও টেনে দিলেন। তারপর বললেন, "মি. রায়চৌধুরী, আপনার খুব কষ্ট হয়েছে জানি। সাধারণ খুনে-গুন্ডাদের সঙ্গে আপনাকে রাত কাটাতে হয়েছে। ইচ্ছে করেই আপনাকে দুপুরে খাবার দেওয়া হয়নি, যাতে মনে হয়, আমরা সত্যি সত্যি আপনার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করছি। আসলে কী জানেন, আমাদের পুলিশের মধ্যেও কিছু কিছু স্পাই আছে, যারা থানার ভিতরের খবর বাইরে চালান করে দেয়।"

কাকাবাবু বললেন, "আমি এমন কী গুরুত্বপূর্ণ লোক, যাতে আমার খবর বাইরে যাবে?"

নিন্‌জানে বললেন, "সেসব পরে বলছি। এখন শুধু এইটুকু জানাচ্ছি যে, আপনাকে আমরা ইচ্ছে করে থানায় আটকে রেখেছি। নইলে, বাইরে আপনার জীবন সংশয় ছিল। কাল রাত্তিরেই আপনি যে বন্ধুর বাড়িতে ছিলেন, সেখানে হামলা হত। খুব সম্ভবত আপনার এই বন্ধুর বাড়িতেও আগুন লাগিয়ে দেওয়া হত, আমরা খবর পেয়েছি।"

নিন্‌জানে সঙ্গে একটা মোটা হাতব্যাগ এনেছেন। সেটা খুলে একপ্যাকেট বিস্কুট বের করে বললেন, "নিন, কয়েকটা বিস্কিট খেয়ে নিন চায়ের সঙ্গে, তাতে আপনার খিদে কিছুটা মিটবে।"

কাকাবাবু চা খেতে খেতে ব্যাগ্রভাবে চেয়ে রইলেন নিন্‌জানের মুখের দিকে। কারা তাঁকে মারতে চাইছে? কেন?

নিন্‌জানে এবার একটা পাইপ ধরিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বললেন, "মি. লোহিয়ার বাড়িতে আগুন লেগেছে, আপনি পরেরদিন তা দেখতে গিয়েছিলেন। সেখানে যে কিছু লোক ছিল, তাদের মধ্যে আমাদের দু'জন স্পাইও মিশে ছিল। আপনি নতুন লোক, তাই ওরা আপনার ফোটো তুলে নিয়েছে।"

কাকাবাবু বললেন, "আমি বুঝতেই পারিনি!"

নিন্‌জানে বললেন, "সেটাই তো স্পাইদের কাজ। এয়ারপোর্টে খোঁজ নিয়ে জানা গেল আপনার নাম। তারপর ইন্টারনেট ঘাঁটতেই পাওয়া গেল আপনার সব পরিচয়।"

কাকাবাবু মনে মনে বললেন, এই হয়েছে এক ইন্টারনেট! আজকাল আর কিছুই গোপন রাখার উপায় নেই!

নিন্‌জানে বললেন, "তখনই বুঝতে পারলাম সব ব্যাপার। মি. রাজা, আপনি নাইরোবিতে এসেছেন একটা মামলায় সাক্ষী দিতে, তাই না?"

কাকাবাবু বললেন, "আমি বেড়াতেই এসেছি, তবে...!"

নিন্‌জানে তাঁকে বাধা দিয়ে বললেন, "আমাদের কাছে আর গোপন করে লাভ নেই। এখানে পুলিশের মধ্যে অনেক গোলমাল আছে, আমি স্বীকার করছি। কিছু কিছু পুলিশ অফিসার ঘুষ খেয়ে চোর-ডাকাতদেরই সাহায্য করে। কিন্তু বিশ্বাস করুন, আমরা সেইসব ঘুষখোরদের ধরে ধরে শাস্তি দিচ্ছি, পুলিশ ডিপার্টমেন্টকে পরিচ্ছন্ন করে তুলছি। হয়তো আরও কিছুটা সময় লাগবে। আপনার পরিচয় জানার পরই বুঝতে পারলাম, আপনার জীবন বিপন্ন। মি. লোহিয়ার বাড়িতে আগুন লাগিয়ে তাকে যেমন ধরে নিয়ে গিয়েছে, ওরা আপনাকেও মারবে কিংবা ধরে নিয়ে যাবে।"

কাকাবাবু বললেন, "কেন? আমার উপর কার কী রাগ থাকতে পারে?"

নিন্‌জানে বললেন, " মি. রাজা, আপনি এখনও কিছু না জানার ভান করছেন? পুলিশের নামে যতই বদনাম থাক, আমরা কিন্তু শেষ পর্যন্ত ফিলিপ কিকুইউকে ধরতে সক্ষম হয়েছি। তার নামে পশুহত্যা, চোরাচালান আর

খুনের অভিযোগ আছে। সে একসময় একটা হোটেলের ম্যানেজার সেজে ছিল। তখন আপনাকে খুন করার চেষ্টা করেছিল। এইসব অপরাধে আমাদের দেশে ফাঁসি হয়।"

কাকাবাবু বললেন, "সে তো জেল থেকে পালিয়েছে শুনেছি।"

নিন্‌জানে বললেন, "মোটেই তা সত্যি নয়, এরকম গুজব রটেছে বটে। পালিয়েছে তার ভাই রবার্ট। ফিলিপকে রাখা হয়েছে কড়া পাহারায়। তার বিরুদ্ধে প্রধান দুই সাক্ষী হলেন আপনি আর মি. লোহিয়া। আগামী কাল কোর্টে ফিলিপের নামে মামলা ওঠার কথা। মি. লোহিয়া নিশ্চয়ই আপনাকে সেকথা জানিয়েছিলেন?"

কাকাবাবু বললেন, "লোহিয়া আমাকে বিশেষভাবে এখানে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। বলেছিলেন অনেক কাজ আছে, তার মধ্যে এই মামলাটাও একটা।"

নিন্‌জানে বললেন, "বাইরে ফিলিপের একটা দল আছে। তাদের পান্ডা এখন ফিলিপের ভাই রবার্ট। সেও অতি নিষ্ঠুর মানুষ। এর মধ্যেই দু'জন লোক খুন হয়েছে, একজন সেই জঙ্গলের হোটেলের অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার, আর-একজন বিখ্যাত পরিবেশবিদ লিওপোল্ড আংগামি। এরা দু'জনেই ফিলিপের বিরুদ্ধে সাক্ষী দেবে বলে কথা ছিল। এদের সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। বাকি রইলেন আপনি আর লোহিয়া। লোহিয়ার কী হয়েছে জানি না। আপনাকে নিরাপদে বাঁচিয়ে রাখা আমাদের পক্ষেই খুব দরকার।"

কাকাবাবু বললেন, "ধন্যবাদ। আমি সহজে মরি না।"

নিন্‌জানে বললেন, "এখন আমাদের কী প্ল্যান তাই-ই, শুনুন। আপনাকে আর আমরা দেশের মধ্যে রাখতে সাহস করছি না। জেলের মধ্যেও আপনি নিরাপদ নন। কারণ, যেসব কয়েদি রয়েছে, তাদের মধ্যেও কেউ কেউ ফিলিপের দলের লোক হওয়াও অসম্ভব কিছু নয়। বাইরে থেকে নির্দেশ এলে এখানেই আপনাকে খতম করে দিতে পারে। জেলের মধ্যে এরকম খুনোখুনি আগেও হয়েছে। সুতরাং আপনাকে অন্য জায়গায় যেতে হবে।"

কাকাবাবু বললেন, "কিন্তু আপনি যে বললেন, কালই ফিলিপের নামে কোর্টে মামলা উঠবে?"

নিন্‌জানে বললেন, "হ্যাঁ। কিন্তু আমরা জজের কাছে আবেদন করব, মামলাটা আরও কিছুদিন পিছিয়ে দিতে। এর মধ্যে আরও সাক্ষী জোগাড় করতে হবে। এরা এমনই সাংঘাতিক লোক যে, এদের বিরুদ্ধে অনেকেই

সাক্ষী দিতে সাহস করে না। ফিলিপ শয়তানটা আরও কিছুদিন জেলেই থাকুক।"

কাকাবাবু বললেন, "অর্থাৎ আপনি বলতে চাইছেন, আমি আর এখানে থাকতে পারব না, আমাকে দেশেই ফিরে যেতে হবে? বেশ তো, আমি কালই...!"

কাকাবাবুকে বাধা দিয়ে নিন্‌জানে বললেন, "না না। আপনাকে দেশে ফিরে যাওয়ার কথা বলিনি। ফিলিপকে ফাঁসানোর জন্য আপনার সাক্ষী দেওয়াটা খুবই জরুরি। আমি শুধু বলছিলাম, আপনি যদি দিনকতক গা ঢাকা দিয়ে থাকতে পারেন। এ জায়গাটা আপনার পক্ষে মোটেই নিরাপদ নয়। আপনি আমার একটা সাজেশান শুনবেন?"

কাকাবাবু বললেন, "হ্যাঁ, শুনব না কেন?"

নিন্‌জানে বললেন, "আপনি কিছুদিনের জন্য আমাদের পাশের দেশ তানজানিয়ায় গিয়ে থাকবেন?"

কাকাবাবু বললেন, "তানজানিয়া? সেখানে কাউকে চিনি না। সেখানে যদি ভাল থাকার জায়গা পাওয়া যায়...!"

নিন্‌জানে বললেন, "সেসব আপনাকে ভাবতে হবে না। আমরা সব ব্যবস্থা করে দেব। ওখানকার পুলিশের সঙ্গে আমার কথা হয়ে আছে। আপনার জন্য চমৎকার বাংলো ঠিক করে দেবে, পুলিশই আপনার সবরকম দেখাশোনা করবে।"

কাকাবাবু তবু মন ঠিক করতে পারলেন না। চুপ করে রইলেন।

নিন্‌জানে আবার বললেন, "তানজানিয়াও ভারী সুন্দর দেশ। অনেক কিছু দেখার আছে। আর-একটা কারণেও তানজানিয়া আপনার কাছে ইন্টারেস্টিং মনে হতে পারে। আমরা যতদূর খবর পাচ্ছি, মি. লোহিয়া এখান থেকে পালিয়ে গিয়ে তানজানিয়াতেই লুকিয়ে আছেন!"

কাকাবাবু চমকে উঠে বললেন, "লুকিয়ে আছেন? আপনারা পাকা খবর পেয়েছেন?"

নিন্‌জানে বললেন, "এখনও ঠিক কনফার্মড নই। আমরা প্রতিবেশী রাজ্য উগান্ডা, তানজানিয়াতেও পুলিশকে মি. লোহিয়ার খবর জানিয়েছি। এর মধ্যে তানজানিয়ার পুলিশই সাড়া দিয়েছে। ওখানে একজন স্পাই ডেফিনিটলি একবার মি. লোহিয়াকে স্পট করেছে। তারপর তিনি আবার কী করে যেন চোখের আড়াল হয়ে গেলেন।"

কাকাবাবু বললেন, "মোম্বাসাতেও একজন কেউ নাকি ওঁকে পার্কে বসে থাকতে দেখেছিল। সেটা তো একেবারে উলটো জায়গায়।"

নিন্‌জানে বললেন, "আরে ধুত। সেটা তো ছিল উড়ো খবর। কেউ টেলিফোনে মজা করেছে। আর এটা দিয়েছে তানজানিয়ার পুলিশ। তারা মোটেই একটা বাজে খবর আমাদের জানাবে না।"

কাকাবাবু বললেন, "ঠিক আছে, আমি তানজানিয়াতেই যাব।"

নিন্‌জানে এবারে উৎসাহিত হয়ে বললেন, "গুড, গুড, গুড। আমরাই আপনাকে পৌঁছে দেব বর্ডারে। ওদিককার পুলিশ আপনাকে রিসিভ করে নেবে। তারপর থেকে ওদের দায়িত্ব।"

কাকাবাবু বললেন, "আমার কিছু জামাকাপড় আর অন্য জিনিসপত্র নিয়ে নিতে হবে।"

নিন্‌জানে বললেন, "তা তো নিতেই হবে। আর আমাদের যেতে হবে গভীর রাত্রে। খুব গোপনে, যেন কেউ টের না পায়। বাইরে বৃষ্টি নেমেছে, এটাই ভাল সময়। চলুন, বেরিয়ে পড়া যাক!"

॥ ৭ ॥

গভীর রাত্রে জিপগাড়িটা চলল গাঢ় অন্ধকার ভেদ করে। এখনও বৃষ্টি পড়ছে।

কাকাবাবু কয়েক ঘণ্টা কাটিয়ে এসেছেন অরুণকান্তির বাড়িতে। তাঁকে চলে যেতে হবে শুনে অরুণকান্তি কিছুতেই কাকাবাবুকে একা ছাড়তে চাননি। অফিসের কাজ থাকলেও তিনি সঙ্গে যাবেন বলে জেদ ধরেছিলেন। কিন্তু পুলিশ কিছুতেই সে কথায় রাজি হয়নি। তাতে নানান অসুবিধে আছে।

কাকাবাবুর সঙ্গে পুলিশের কর্তা নিন্‌জানে আসেননি। একজন বিশ্বস্ত অফিসারকে সঙ্গে দিয়েছেন। এ ছাড়া গাড়ির পিছনে রয়েছে দু'জন অস্ত্রধারী প্রহরী।

একে তো ঘুরঘুট্টি অন্ধকার, তার উপরে বৃষ্টি। বাইরেটা কিছুই দেখা যায় না। এ দেশে রাত্তিরে গাড়ি চালানো বেশ বিপজ্জনক। প্রায়ই রাস্তার উপর নানান জন্তু-জানোয়ার চলে আসে। গতবার কাকাবাবু একটা জলহস্তী পর্যন্ত দেখতে পেয়েছিলেন। আর যদি হাতির পাল আসে, তা হলে সত্যিই ভয়ের

ব্যাপার হয়। আফ্রিকায় হাতিরা আমাদের দেশের হাতির চেয়েও অনেক বেশি বড়। তা ছাড়া প্রত্যেকেরই লম্বা লম্বা দাঁত। আমাদের দেশের সব হাতির দাঁত থাকে না।"

এই হাতিরা খেলার ছলে গাড়ি উলটে দিতে পারে। তা যদি না-ও দেয়, রাস্তা থেকে কখন যে সরবে, তা জানার উপায় নেই। হাতিদের তো কোনওক্রমেই তাড়িয়ে দেওয়া যায় না।

এক জায়গায় সত্যিই জিপ থামিয়ে নিঃশব্দে বসে থাকতে হল। খানিক দূরে হাতির পাল রাস্তা দিয়ে একধার থেকে অন্যদিকে যাচ্ছে। অন্ধকারে তাদের দেখা যাচ্ছে না বটে, কিন্তু শোনা যাচ্ছে তাদের ডাক।

বেশ কিছুক্ষণ পর আর কোনও সাড়াশব্দ না পাওয়ায় জিপটা আস্তে আস্তে এগোল।

বৃষ্টি থামল ভোরের দিকে।

বেলা প্রায় এগারোটার সময় জিপটা থামল তানজানিয়ার সীমান্তে। এখানে একটা চেকপোস্ট আছে। আগে থেকেই ফোনে জানানো হয়েছে, তাই একজন অফিসার অপেক্ষা করছেন অভ্যর্থনা জানাবার জন্য।

অন্য দেশে যেতে ভিসা লাগে, সাময়িক ভিসার ব্যবস্থাও হয়ে গেল এখানে।

যে-পুলিশ অফিসারটি সঙ্গে এসেছে, সে বলল, "স্যার, আমাদের তো আর বেশি যাওয়ার পারমিশান নেই। তানজানিয়ার পুলিশ আপনার সবরকম দেখাশোনার দায়িত্ব নেবে। গুড বাই!"

তানজানিয়ার পুলিশ অফিসারটি খুব বিনীতভাবে বলল, "স্যার, আমার নাম বিল্। আর কিছু নেই, শুধুই বিল্। আপনার সম্পর্কে অনেক কিছু শুনেছি। আপনি তানজানিয়ায় অতিথি হয়ে এসেছেন, এ জন্য আমরা গর্বিত। আমাদের মিনিস্টার বলেছেন, আপনার যাতে কোনও অসুবিধে না হয়, তা দেখতে। আপনার জন্য আমরা যথাসাধ্য ভাল ব্যবস্থা করে রেখেছি। তবু আপনার আর যা কিছু লাগবে, তৎক্ষণাৎ আমাকে জানাবেন।"

কাকাবাবু বললেন, "ধন্যবাদ! আমার তো বিশেষ কিছু লাগে না। একটু নিরিবিলিতে থাকা, আর শোওয়ার জন্য একটা বিছানা।"

বিল্ বলল, "আপনার জন্য একটা বাংলোয় থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। সেখানে শুধু আপনি থাকবেন। আপনি সারারাত জার্নি করে এসেছেন, এখন আপনার ঘুম দরকার। আপনি এখন বিশ্রাম নিন, বাকি কথা পরে হবে।"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "আপনারা লোহিয়ার খোঁজ পেয়েছেন?"

বিল্ বলল, "ইয়েস! সেসব কথা পরে হবে।"

গাড়িটা এসে থামল একটা সাদা রঙের দোতলা বাড়ির সামনে। চারদিকে অনেকখানি কম্পাউন্ড। বড় বড় গাছ দিয়ে ঘেরা।

এরকম বাড়ি দেখলেই পছন্দ হয়।

গেটের দু'পাশে দুটি গুমটিতে দাঁড়িয়ে আছে দু'জন প্রহরী। কী যেন একটা পাখি ডাকছে জোর গলায়।

কাকাবাবুকে দোতলায় পৌঁছে দিয়ে বিল্ বিদায় নিল।

একজন আরদালি এনে দিল গরম গরম কফি।

কাকাবাবু সেই কফি পান করে স্নান সেরে নিলেন। তারপর আর ব্রেকফাস্ট-লাঞ্চ খাওয়ার কথা মনেই রইল না, তিনি শুয়ে পড়লেন। ধপধপে নরম বিছানা, শরীরও খুব ক্লান্ত, ঘুম এসে গেল সঙ্গে সঙ্গে।

ঘুম ভাঙল সন্ধের কাছাকাছি।

এখন শরীর বেশ ঝরঝরে লাগছে। এবার খিদেও পেয়েছে। এই সময় আর ভাত বা রুটি খেতে ইচ্ছে করে না। বেয়ারা এসে খবর নিতেই কাকাবাবু তাকে কয়েকটা টোস্ট আর একটা ডাব্‌ল অমলেটের অর্ডার দিলেন।

খানিক পরে এসে হাজির হল বিল্। প্রথমেই জিজ্ঞেস করল, "আপনার কোনও অসুবিধে হয়নি তো স্যার?"

কাকাবাবু বললেন, "কিছুমাত্র না। খুব ভাল ঘুমিয়েছি। ঘুমটা খুব দরকার ছিল।"

বিল্ জিজ্ঞেস করল, "রাত্রে কী খাবেন স্যার? যা চাইবেন, বানিয়ে দেবে, সব ব্যবস্থা আছে।"

কাকাবাবু বললেন, "জেব্রার মাংসের কাটলেট কিংবা ফ্লেমিংগো পাখির ঝোল আমার দরকার নেই। যদি মাছ পাওয়া যায়, তা হলে সেই মাছভাজা, ঝোল করতে বারণ করবেন। যদি ডাল পাওয়া যায়, তা হলে একটু ডাল আর ছোট্ট একবাটি ভাত।"

বিল্ বলল, "এ সবই হয়ে যাবে স্যার।"

কাকাবাবু বললেন, "এবার বলুন, লোহিয়ার কী খবর?"

বিল্ বলল, " মি. লোহিয়ার ব্যাপারটা একটু রহস্যময়। তাঁকে এ দেশে দেখা গিয়েছে অন্তত তিনবার। আমাদের একজন এজেন্ট তাঁর ফোটোও তুলেছে।"

কাকাবাবু বললেন, "ফোটো তুলেছে? একবার দেখতে পারি?"

বিল্ একটু ইতস্তত করে বলল, "সেটা তো সঙ্গে আনিনি। পরে আপনাকে দেখিয়ে দেব। তাঁর অন্য ফোটোর সঙ্গে মিলিয়ে দেখা হয়েছে, কোনও ভুল নেই।"

কাকাবাবু বললেন, "আপনাদের যে এজেন্ট তাঁকে দেখেছে, সে কি তাঁকে একা দেখেছে?"

বিল্ বলল, "প্রত্যেকবারই একা।"

কাকাবাবু বললেন, "কেউ তাঁকে জোর করে ধরে রাখেনি। তিনি নিজেই লুকিয়ে রয়েছেন।"

বিল্ বলল, "ঠিক তাই। তিনি পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। সেই জন্যই এক জায়গায় বেশিক্ষণ থাকছেন না। তিনি জানেন, তাঁর জীবনের ভয় আছে।"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "শেষবার তাঁকে কোথায় দেখা গিয়েছে?"

বিল্ নিজের চেয়ারটা একটু এগিয়ে এনে নিচু গলায় বলল, "এইবারেই আসল কথা। আমাদের ধারণা, তিনি এখন এমন এক জায়গায় লুকিয়ে আছেন, যেখানে কেউ তাঁকে খুঁজে পাবে না। আমি নিজে তাঁকে সেখানে খুঁজতে যাব ভাবছি। তিনি আমাদের দেশের অতিথি। অত বড় ব্যবসায়ী। তাঁকে আমরা সবরকম সাহায্য করতে চাই।"

কাকাবাবু বললেন, "সে জায়গাটা কোথায়, তা জানতে পারি?"

বিল্ বলল, "হ্যাঁ, পারেন। আমরা সঠিক খবর পেয়েছি, তিনি আশ্রয় নিয়েছেন এন গোরোংগোরোর পেটের মধ্যে!"

কাকাবাবু দারুণ বিস্ময়ের সঙ্গে বললেন, "গোরোংগোরো! আগ্নেয়গিরি?"

বিল্ বলল, "হ্যাঁ। আমরা বলি, 'এন গোরোংগোরো'। বাইরের লোক শুধু 'গোরোংগোরো'ই বলে। আপনি কি জানেন, সেই আগ্নেয়গিরির তলায় এখন অনেক কিছু আছে?"

কাকাবাবু বললেন, "জানব না মানে? সবই জানি। গোরোংগোরো তো পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য! এই আগ্নেয়গিরির পেটের মধ্যে যেন রয়েছে আর-একটা মিনি পৃথিবী। সেখানে ঘন বন আছে, অনেক রকম জন্তু-জানোয়ার আছে। এমনকী, সিংহ পর্যন্ত। আবার কিছু কিছু মানুষও। তাই না?"

বিল্ বলল, "ঠিক বলেছেন। সত্যিই বিস্ময়কর ব্যাপার। পৃথিবীর নানাদেশ থেকে টুরিস্ট দেখতে আসে।"

কাকাবাবু বললেন, "আমারও তো অনেক দিনের ইচ্ছে গোরোংগোরো দেখতে যাওয়ার। গতবার কেনিয়ায় এসেও আর এদিকে আসা হয়নি।"

বিল্ বলল, "জানি। আপনি সেরেংগেটি জঙ্গলে এসে খুব বিপদে পড়েছিলেন। আপনি বিদেশ থেকে এসে আমাদের এ অঞ্চলের বন্যপ্রাণীদের বাঁচাবার জন্য কত সব কাজ করেছেন, তার জন্য আপনার কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।"

কাকাবাবু বললেন, "সে এমন কিছু না। লোহিয়া ওই গোরোংগোরোর জঙ্গলের মধ্যেই আশ্রয় নিয়েছে, এ ব্যাপারে আপনারা নিশ্চিত?"

বিল্ বলল, "প্রায় নিশ্চিত বলা যায়। একেবারে চাক্ষুষ করার জন্যই কাল সেখানে যাচ্ছি। আপনি আমার সঙ্গে যেতে চান?"

কাকাবাবু উত্তেজিতভাবে বললেন, "অবশ্যই! লোহিয়াকে খুঁজে বের করতে চাই তো বটেই। তা ছাড়াও ওই বিখ্যাত জায়গাটা আমার দেখা হয়ে যাবে।"

বিল্ বলল, "ভালই হল, আমরা দু'জনে একসঙ্গে যাব। কাল খুব ভোরে।"

কাকাবাবু বললেন, "আমি তৈরি হয়ে থাকব।"

বিল্ বলল, "রাত্তিরটায় আপনি বিশ্রাম নিন। তবে স্যার, একটা বিশেষ অনুরোধ, আপনি সন্ধের পর আর এই কম্পাউন্ডের বাইরে কোথাও যাবেন না। আপনার জীবনের অনেক দাম। কে কোথা থেকে আক্রমণ করবে, তার তো ঠিক নেই। তবে, এই কম্পাউন্ডের মধ্যে কেউ ঢুকতে পারবে না।"

বিল্ বিদায় নেওয়ার পর কাকাবাবু একই জায়গায় চুপ করে বসে রইলেন।

কী করে একটার পর-একটা ঘটনা গড়িয়ে যাচ্ছে!

পরশু রাত্রে ছিলেন থানার মধ্যে একটা বিচ্ছিরি নোংরা ঘরে, বিছানাও ছিল না, দেওয়ালে ঠেসান দিয়ে বসে পুরো রাত কাটিয়ে দিতে হয়েছে। কাল রাতটা প্রায় কেটেছে গাড়িতে। আজ আবার এমন চমৎকার আরামের বিছানায়।

কাল আবার যাওয়া হবে গোরোংগোরো। এখানকার লোকেরা বলে উল্‌ল্‌ল্ গোরোংগোরো, সেরকম উচ্চারণ করা খুব শক্ত। গোরোংগোরোই ভাল। পুরনো আগ্নেয়গিরি! বৈজ্ঞানিকরা বলেছেন, এই আগ্নেয়গিরি জ্যান্ত হয়ে আগুন আর লাভা বের করেছিল সেই বহু কাল আগে, প্রায় তিরিশ লাখ

বছর আগে, যখন এই পৃথিবী সবেমাত্র হাঁটতে শিখেছে।

গোরোংগোরো ছিল খুব উঁচু পাহাড়, বিস্ফোরণে এর শিখরের অনেকটা উড়ে গিয়েছিল, তৈরি হয়েছিল বিশাল খোঁদল। তার তলাটা অনেকখানি চওড়া। সে জায়গা আস্তে আস্তে ঠান্ডা হয়ে গিয়ে গাছপালা জন্মেছে। এত বছরের মধ্যে আর অগ্ন্যুৎপাত হয় না। তবে, এই আগ্নেয়গিরিকে একেবারে মৃত বলা যায় না। এখানে আছে মোট ন'টা চূড়া, তার মধ্যে একটার নাম ওলডোনিয়ো লেঙ্গাল, সেই চূড়া থেকে মাঝে মাঝেই ধোঁয়া আর গরম ছাই বেরিয়ে আসে। তবে মূল গোরোংগোরোর আশ্চর্য সুন্দর গহ্বর দেখার জন্য ছুটে আসে পৃথিবীর বহু দেশের মানুষ।

কাকাবাবু ভাবলেন, ইস, সন্তু আর জোজোকে এবার নিয়ে আসা গেল না! ওরা দেখতে পেল না!

খানিক পর শুয়ে পড়ে তিনি ঘুমের মধ্যেও গোরোংগোরোর স্বপ্ন দেখতে লাগলেন।

পরদিন ভোরবেলা যাত্রা। বৃষ্টি পড়ছে খুব।

আরুশা শহর থেকে যেতে হবে পঁচাত্তর মাইল। এমন কিছু নয়। যেতে যেতেই বিল্ বলল, "উপরে গিয়ে আগ্নেয়গিরির পেটের মধ্যে নামার জন্য একটা কাঁচা রাস্তা আছে। খুব সাবধানে নামতে হয়। আপনি তো নামতে পারবেন না।"

কাকাবাবু বললেন, "পারব না? সে কী? তা হলে যাচ্ছি কেন? হ্যাঁ, ঠিক পারব!"

বিল্ বলল, "ক্রাচ নিয়ে নামা খুব রিস্কি। একরকম ব্যবস্থা আছে। খাড়া রাস্তা ধরে নামতে হয় তো, তাই স্পেশ্যাল, বড় বড় চাকাওয়ালা গাড়ি। আশা করি কিছুক্ষণের মধ্যে এই বৃষ্টি কমে যাবে। বৃষ্টির মধ্যে ভিতরে নামা খুব মুশকিল।"

কিন্তু বৃষ্টি থামল না। বরং আরও জোরে হয়ে গেল। শিখরের উপরে উঠে পাওয়া গেল দুঃসংবাদ।

মাসাই জাতির কয়েকটি মহিলা ও বাচ্চা ছেলে দাঁড়িয়ে আছে একটা চালার নীচে। বাচ্চাদের হাতে ফুলের মালা, আর মহিলারা এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করতে লাগল, "ফোটো?"

এরা টুরিস্টদের সঙ্গে ফোটো তুলিয়ে কিছু পয়সা পায়। বিল্ তাদের সঙ্গে কথা বলে জানল, আজ গাড়ি চলছে না, রাস্তা বন্ধ। এক জায়গায় এত বৃষ্টিতে

ধস নেমে গিয়েছে। সেখানে রাস্তা সারাতে দু'-তিনদিন লেগে যাবে। তাই আজ আর টুরিস্ট আসেনি।

সে খবর শুনে কাকাবাবু দারুণ হতাশভাবে বললেন, "যাঃ! যাওয়া হবে না?"

বিল্ বলল, "কয়েকদিন অপেক্ষা করতেই হবে। রাস্তা ভাঙা।"

কাকাবাবু বললেন, "রাস্তা ভাঙা হলেও পায়ে হেঁটে যাওয়া যেতে পারে নিশ্চয়ই। ক্রাচ নিয়েও আমি খুব সাবধানে নামতে পারব।"

বিল্ বলল, "ইম্পসিবল। আপনি ভি আই পি লোক, আপনার কোনও অ্যাক্সিডেন্ট হলে বা কোনও ক্ষতি হলে আমাকে জবাবদিহি করতে হবে।!"

কাকাবাবু ফ্যাকাশে মুখে দাঁড়িয়ে রইলেন।

এতদূর এসেও ফিরে যেতে কিছুতেই তাঁর মন চাইছে না। তিন-চারদিনের মধ্যে আবার কী ঘটে যাবে কে জানে? হয়তো আর গোরোংগোরো দেখাই হবে না।

বিল্ একটু দূরে গিয়ে মোবাইল ফোনে কার সঙ্গে যেন কথা বলতে লাগল।

বৃষ্টি প্রায় থেমে গিয়েছে, এখনও একটু একটু ঝিরঝির করে পড়ছে। বেশ শীত শীত ভাব।

মিনিটদশেক পর ফোন থামিয়ে বিল্ কাছে এসে বলল, "একটু আশা আছে। আমি কয়েক জায়গায় ফোন করলাম। দুবাই-এর রাজা, তাঁর দুই রানি আর সঙ্গে আরও তিনজন বেড়াতে এসেছেন। ওঁদেরও আজ গোরোংগোরোর তলায় যাওয়ার কথা। আমরা বলি কিং, আসলে তো ওঁরা আরবের শেখ, ওঁদের প্রচুর টাকা। রাস্তা বন্ধ বলে তো দু'-তিনদিন অপেক্ষা করবেন না, না দেখে ফিরেও যাবেন না। সেইজন্য ওঁরা একটা বেলুন ভাড়া নিয়েছেন, সেই বেলুনে চেপে আগ্নেয়গিরির পেটের মধ্যে যাবেন। সেই বেলুনে প্রায় দশজন ধরে, আমাদের দু'জনকেও নিতে পারেন। কিন্তু...!"

কিন্তু বলে সে থেমে গেল।

কাকাবাবু আবার অত্যন্ত উৎসাহিত হয়ে ব্যগ্রভাবে বললেন, "তা হলে আবার কিন্তু কী? আমরা ওই বেলুনেই যাব।"

বিল্ বলল, "যেতে তো পারি, কিন্তু বেলুন কোম্পানির ম্যানেজার আমাকে বলল, রাজা গোটা বেলুনটা ভাড়া নিয়েছেন, অন্য লোকদের সঙ্গে নিয়ে যেতে চাইবেন না। আমি বড়জোর অনুরোধ করতে পারি যে, এঁরা আমার

নিজের লোক। তাতে রাজি হতে পারেন। তার জন্য আমাদের দু'জনকেও ভাড়ার টাকা দিতে হবে। টাকা তিনি ছাড়বেন না। স্যার, আমার সঙ্গে বেশি টাকা নেই!"

কাকাবাবু সঙ্গে সঙ্গে বললেন, "সেজন্য চিন্তা করতে হবে না। আমার কাছে ট্রাভেলার্স চেক আছে। টাকা যা লাগে, আমি দিয়ে দেব।"

বিল্ কাঁচুমাচুভাবে বলল, "স্যার, আপনি আমাদের অতিথি। আপনার থেকে টাকা নেওয়া মোটেই উচিত নয়। আমি সেই কথাই ভাবছি।"

কাকাবাবু তার কাঁধে হাত দিয়ে বললেন, "বিল্, ও নিয়ে কিছু বোলো না, প্লিজ! আমার অনেক দিনের ইচ্ছে, এই আগ্নেয়গিরির তলায় যাওয়ার। এরকম সুযোগ তো মানুষের জীবনে দু'বার আসে না। তা ছাড়া, লোহিয়া আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু, তাঁকে যদি খুঁজে পাই...!"

বিল্ বলল, "তা হলে আর আধঘণ্টার মধ্যেই বেলুন এসে যাবে রাজার। আপনার বেলুনে চাপার অভ্যেস আছে তো?"

কাকাবাবু এবার হেসে ফেললেন। তিনি বললেন, "অভ্যেস মানে, জীবনে আগে কখনও বেলুনে চাপিইনি। ফোটোয় দেখেছি, সিনেমায় দেখেছি। আমাদের দেশে তো এখন আর বেলুন চলেই না। প্লেন কিংবা হেলিকপ্টার।"

বিল্ বলল, "এই গোরোংগোরোর মধ্যে প্লেন কিংবা হেলিকপ্টার তো চলে না। বেলুনই সবচেয়ে সুবিধে।"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "বেলুনে চাপা কি প্র্যাকটিস করতে হয়?"

বিল্ বলল, "না, তার ততটা দরকার নেই। নার্ভাস না হলেই হল। খুব হাওয়া না দিলে ভয়ের কিছু নেই। এই ক্রেটারের মধ্যে তেমন হাওয়া নেই। যত নীচে নামবে, ততই ঠান্ডাটা কমে যাবে।"

এরপর শুরু হল প্রতীক্ষা। কাকাবাবু আকাশের দিকে তাকিয়ে রইলেন। এখানে আকাশে সব সময়ই নানারকম পাখি দেখা যায়।

ঝাঁক-বাঁধা ফ্লেমিঙ্গো তো আছেই। কাকাবাবু অনেক পাখির নাম জানেন না। সেইরকম পাখিদের মধ্যে থেকেই একসময় একটা ছোট্টমতো দেখা গেল বেলুনটাকে। ক্রমশ বড় হতে লাগল সেটা। তারপর একসময় এসে পড়ল একেবারে কাছে। সাদার উপরে লাল ডোরা। আগ্নেয়গিরির মুখের একটু উপরে এসে থেমে গেল বেলুনটা। দুলতে লাগল। সেখান থেকে নেমে এল একটা দড়ির সিঁড়ি।

কাকাবাবু ক্রাচ দুটো বিলের হাতে দিয়ে দিব্যি তরতর করে উঠে গেলেন দড়ির সিঁড়ি বেয়ে।

বিল্‌ও উঠে আসার পর বেলুনটা আবার দুলতে দুলতে নামতে লাগল গহ্বরের মধ্যে।

দুবাইয়ের কিং বেশ ভদ্র। তিনি কাকাবাবুকে দেখে বললেন, "গুড মর্নিং, সেলাম আলেকুম।"

কাকাবাবু বললেন, "গুড মর্নিং। আলাইকুম আস্‌সালাম।"

বেলুনচালক অনুরোধ করল, "প্লিজ, এখানে কেউ এখন কথা বলবেন না।"

তখন সবাই চুপ। কাকাবাবুও মনে মনে ধারণা করেছিলেন; আগ্নেয়গিরির ভিতরটা বোধহয় অন্ধকার। মোটেই তা নয়। উপরের মুখটা অনেকটা চওড়া। যথেষ্ট রোদ্দুর ঢোকে। খানিক নামবার পর তলাটাও দেখা যায়।

কাকাবাবুর আবার মনে পড়ল সন্তু আর জোজোর কথা। নীচে নামার অভিজ্ঞতায় তাঁরই উত্তেজনা হচ্ছে, আর ওদের মতো বয়সে নিশ্চয়ই দারুণ রোমাঞ্চ হত। ফিরে গিয়ে ওদের কাছে গল্প শোনালে ওরা নিশ্চয়ই আফশোস করবে।

কিন্তু ওদের পরীক্ষা শেষ হওয়া পর্যন্ত যে অপেক্ষা করা গেল না। লোহিয়া কেন এত তাড়া দিচ্ছিলেন ঠিক এই সময় আমার জন্য, তা এখানে এসে তিনি বুঝতে পেরেছেন। ওই ফিলিপ কিকুইউ-এর মামলাটায় সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য। এর মাঝখানে ঘটে গেল কত কিছু!

আগ্নেয়গিরির ভিতরটা ক্রমশই চওড়া হচ্ছে। তলার জায়গাটা প্রায় সমতল। এদিক-ওদিক অনেক দূর দেখা জায়গাটা যে আগ্নেয়গিরির পেটের মধ্যে, তা বোঝাই যায় না। সব দিকে শুধু ঘাসের মতোই দেখা যায়, পাশ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে একটা ছোট নদী।

বেলুন থেকে নামার পর বিল্‌ কাকাবাবুকে বলল, এক জায়গায় দাঁড়াতে। কাকাবাবুর কাছ থেকে চেক নিয়ে সে গেল বেলুনচালককে ভাড়ার টাকা বুঝিয়ে দিয়ে আসতে।

খানিক পর ফিরে এসে বলল, "শুনুন স্যার। রাজাটাজাদের ব্যাপার! সব সময় ব্যস্ত। তাঁরা মাত্র দু'ঘণ্টা পরেই বেলুন নিয়ে ফিরে যেতে চান। কিন্তু মাত্র দু'ঘণ্টায় আমরা কী দেখব? তাই আমরা যদি দু'ঘণ্টা পরে না ফিরি, আজকের রাতটা এখানেই থেকে যেতে চাই। তাতে আপনার আপত্তি আছে?"

কাকাবাবু বললেন, "মোটেই আপত্তি নেই। আমিও এত তাড়াতাড়ি ফিরতে রাজি নই।"

বিল্ বলল, "রাত্রে থাকার ব্যবস্থা আছে। হয়তো আপনার বেশ অসুবিধে হবে। বিছানাটিছানা বোধহয় পাবেন না।"

কাকাবাবু বললেন, "আমার ওসব কিছু দরকার নেই। কোনওরকমে একটা মাথা গোঁজার জায়গা পেলেই হল। আমি তিন-চারদিনও থেকে যেতে রাজি আছি।"

বিল্ বলল, "তার বোধহয় দরকার হবে না। চলুন!"

বেলুনের নামার জায়গাটা চতুর্দিকে বেড়া দিয়ে ঘেরা। তার মধ্যে কটেজও রয়েছে। একদিকের গেট দিয়ে বেরিয়ে এলেন কাকাবাবু আর বিল্।

একটা সরু রাস্তার দু'পাশে ফসলের খেত। বিল্ সব বুঝিয়ে দিল, "ওগুলো কোনও ফসল নয়, এক রকমের ঘাস। এই অঞ্চলটা মাসাই জাতির লোকদের জন্য সংরক্ষিত। তারা এখানে মোষ আর ভেড়া চরায়। ঘাস ওইসব পশুদের খুব পছন্দ। আবার হাতিরাও এই ঘাস ভালবাসে। তা হাতিও আসে অনেক।

"এই জায়গাটা আগ্নেয়গিরির তলায় হলেও পুরোটাই পাথরে ঢাকা নয়। মাঝে মাঝে খোলা জায়গা আছে। সেখান দিয়েও মানুষ কি জন্তু-জানোয়ার আসতে পারে, বেরিয়েও যেতে পারে। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, যেসব জন্তু-জানোয়ার এখানে একবার ঢুকে পড়েছে, তারা আর বেরিয়ে যেতে পারে না। এখানেই তারা জন্মায়, আবার এখানেই মরে। কেন যে এই জায়গাটা তাদের পছন্দ, তা বলা মুশকিল।" রাস্তা দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে বিল্ কাকাবাবুকে এইসব কথা শোনাতে লাগল।

মাঝে মাঝে দু'-একজন মাসাইকে চোখে পড়ল। তারা প্রত্যেকেই ছ'ফুটের মতো লম্বা, হাতে বর্শা আর গলায় নানারকম পুঁতির মালা।

এক এক জায়গায় রয়েছে তাঁবুর রেস্তরাঁ। সব চেয়ার ফাঁকা। আজ আর কোনও টুরিস্ট আসেনি। রেস্তরাঁর লোকজন ডাকাডাকি করতে লাগল কাকাবাবুদের।

এক জায়গায় ওঁরা দু'জনে বসলেন।

দু'কাপ কফির অর্ডার দেওয়ার পর কাকাবাবু বললেন, "আমার এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না, আমি গোরোংগোরো আগ্নেয়গিরির ভিতরে বসে আছি!"

বিল্ বলল, "আমারও ইচ্ছে আছে, একদিন আপনাদের দেশে গিয়ে তাজমহল দেখে আসব।"

কাকাবাবু বললেন, "চলে এসো একবার। দিল্লিতে আমার চেনাশুনো আছে, আমি বলে দেব, তোমাকে সাহায্য করবে।"

বিল্ হেসে বলল, "দাঁড়ান, আগে টাকাপয়সা জোগাড় করি। স্যার, আপনি কফির সঙ্গে কিছু খাবেন?"

কাকাবাবু বললেন, "হ্যাঁ, কিছু একটা খেয়ে নিলেও হয়। কী পাওয়া যাবে?"

বিল্ বলল, "স্যান্ডুইচ আছে, অনেক রকম মাংসের রোস্ট, ডিমের অমলেট।"

কাকাবাবু বললেন, "কী মাংস, তার তো কোনও ঠিক নেই। আমি সবই খাই, গোরু-শূকর, সাপ-ব্যাং, কোনওটাতেই আপত্তি নেই, যদি খেতে ভাল হয়। একবার এখানে মুরগির ঝোল বলে ফ্লেমিংগো পাখির ঝোল দিয়েছিল। মুরগির চেয়ে ফ্লেমিংগো সস্তা। ওরে বাবা, সে এমন শক্ত যে দু' হাত দিয়ে টেনেও ছিঁড়তে পারলাম না। আর ওয়াইল্ড বিস্টের মাংসের কাটলেট, এমনই দরকচা ধরনের যে, কিছুই চিবোতে পারি না। গন্ধটাও কীরকম যেন। মনে হয়েছিল ওই মাংস খেতে হলে সিংহের মতো দাঁত দরকার!"

বিল্ বলল, "ওয়াইল্ড বিস্ট তো এখানে সিংহও খায়, মানুষও। ওই জন্তুগুলো এত বেশি পাওয়া যায়!"

কাকাবাবু বললেন, "থাক, ওসব দরকার নেই। বরং কয়েকটা ভেজিটেব্‌ল স্যান্ডুইচ বলে দাও, আপাতত তাই-ই খেয়ে নেব।"

দু'প্লেট স্যান্ডুইচ অর্ডার দেওয়ার পর বিল্ জিজ্ঞেস করল, "কলকাতায় সাধারণত আপনারা কী খান?"

কাকাবাবু বললেন, "ভাত, ডাল, তরকারি, মাঝের ঝোল। চিকেন, মাটনও খাই। আমাদের মাটন মানে কিন্তু ভেড়ার মাংস নয়, গোট মিট। গোট কাকে বলে তা তোমরা জানোই না।"

বিল্ বলল, "কলকাতায় গিয়ে একবার বাঙালি খাবার খাব।"

কাকাবাবু বললেন, "কলকাতা পর্যন্ত যদি আসতে পারো, তা হলে আমাদের কাছে থাকবে। আমার বড়ভাইয়ের স্ত্রী অনেক রকম রান্না জানেন। শুধু খাওয়া নয়, কলকাতায় গেলে আমি তোমাকে সুন্দরবনে ঘুরিয়ে আনব। দেখবে, সে একেবারে অন্যরকম ফরেস্ট। সেখানে আছে রয়ালবেঙ্গল টাইগার। তোমাদের গোটা আফ্রিকাতেই তা নেই। অত বড় বাঘ তোমরা চোখেই দ্যাখোনি।"

বিল্ বলল, "ফোটোয় দেখেছি।"

গল্পে গল্পে খানিকটা সময় কেটে গেল।

উঠে কাকাবাবু দাম দিতে গেলেন। বিল্ বলল, "না না, স্যার। এটা আপনি নয়, আমাকে দিতে দিন। আপনি আমাদের দেশের অতিথি। আমি গরিব হলেও এইটুকু তো দিতেই পারি। আমি কলকাতায় গেলে আপনি আমাকে খাওয়াবেন।"

কাকাবাবু কয়েকবার আপত্তি করলেন, তবু বিল্ শুনল না।

দোকান থেকে বেরিয়ে কাকাবাবু বললেন, "আমি এ জায়গাটা দেখতে এসেছি সেটা ঠিক কথা। কিন্তু লোহিয়ারও তো খোঁজ করতে হবে? সে যে এখানেই আছে, সে ধারণা তোমাদের কী করে হল?"

বিল্ বলল, "আমাদের ইনফর্মার যা খবর দিয়েছে তা যদি সত্যি হয়, তবে এখানেই তিনি লুকিয়ে আছেন। লুকোবার পক্ষে এটা আদর্শ জায়গা। এখানে বহু বিদেশি টুরিস্ট আসে বলে পুলিশের নজরদারি খুব কড়া। চোর-ডাকাত এখানে আসতেই পারে না। আর-একটু দূরে একটা লেক আছে, তার নাম লেক মিগাই। তার ধারে কয়েকটি ছোট ছোট টুরিস্ট লজ নতুন হয়েছে। সেখানে যদি মি. লোহিয়া গেস্ট হয়ে থাকেন, কেউ তাঁর খোঁজ পাবে না। চলুন স্যার, আগে আমরা সেই জায়গাটা দেখি। পারবেন তো?"

কাকাবাবু বললেন, "খুব পারব। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে-নামতে আমার অসুবিধে হয়। কিন্তু প্লেন রাস্তা দিয়ে আমি অনেকদূর যেতে পারি।"

একটু দূর যেতে না-যেতেই সরু রাস্তাটা লাফিয়ে লাফিয়ে পার হতে লাগল একপাল হরিণ। প্রায় পঞ্চাশ-ষাটটা।

কাকাবাবু বললেন, "এগুলোকে বলে টমসন্‌স গ্যাজেল্‌স, তাই না? তিড়িংতিড়িং করে লাফাতে পারে।"

বিল্ বলল, "হ্যাঁ। হরিণ এখানে নানারকম আছে। ডান দিকে তাকিয়ে দেখুন, একটা গন্ডার দাঁড়িয়ে আছে খানিকটা দূরে। আমাদের দিকেই তাকিয়ে আছে। ওরকম গন্ডার আগে দেখেছেন?"

কাকাবাবু বললেন, "না, আগে দেখিনি, তবে জানি। কালো গন্ডার। এদের সংখ্যা খুবই কমে এসেছে। ও আমাদের দিকে তেড়ে আসবে না?"

বিল্ বলল, "গন্ডার অকারণে মানুষকে তাড়া করে না। ওরা তো মানুষের মাংস খায় না!"

কাকাবাবু বললেন, "ওরকম শক্তপোক্ত প্রাণী শুধু ঘাসপাতা খেয়ে

বেঁচে থাকে, আশ্চর্য না? হাতিও তাই। এখানে নানান রকম জন্তু-জানোয়ার আছে। কিন্তু কারও ক্ষতি করে না। ঠিক যেমন আমাদের তপোবনের কথা শুনেছি...!"

বিল্ বলল, "কিন্তু খাদ্য-খাদকের সম্পর্ক তো থাকবেই। এত হরিণ, ওয়াইল্ড বিস্ট, বুনো মোষ আছে বলেই তাদের খাওয়ার জন্য সিংহ, চিতা, হায়েনাও আছে। অনবরতই এ ওকে...!"

কাকাবাবু বললেন, "ও হ্যাঁ। হিংসে, মারামারি তো থাকবেই। সারা পৃথিবীতেই চলছে, তো এখানকার মানুষরা কী করে? তারা জন্তু-জানোয়ার মারে না?"

বিল্ বলল,"আপনাকে তো আগেই বলেছি, পুলিশের নজরদারি এখানে খুব কড়া! একটা স্থায়ী পুলিশক্যাম্প আছে। তবু দু'-একটা চোরাশিকারি মাঝে এসে পড়তেই পারে। পুলিশকে ঘুষ খাওয়ায়। কোথায় পুলিশ ঘুষ খায় না বলুন?"

কাকাবাবু বললেন, "থাক ও কথা। এখন ওসব খারাপ জিনিস ভাবতেও ইচ্ছে করছে না। বিকেল শেষ হয়ে আসছে, কী চমৎকার লাগছে চতুর্দিক। রোদ্দুর নেই, চাপা আলো। একদিকে দেখতে পাচ্ছি, আগ্নেয়গিরির ভিতরের দেওয়াল উঠে গিয়েছে ওদিকে। কতরকম পাখি ডাকছে...!"

বিল্ বলল, "স্যার, একটু সাবধান। আমরা লেকের কাছে এসে গিয়েছি। বেশি ধারে যাবেন না। হঠাৎ কোনও জলহস্তী উঠে আসতে পারে।"

অনেকটা হেঁটে এসেছেন বলে কাকাবাবু একবার থামলেন।

এখানে গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে রয়েছে কয়েকটা তাঁবুর কটেজ। একেবারেই জনমানবশূন্য। বোঝাই যাচ্ছে, আজ কোনও টুরিস্ট আসতে পারেনি। টুরিস্টদেরও কী এতদূর হেঁটে আসতে হয়? নাকি আর কোনও রাস্তা আছে? থাকবে নিশ্চয়ই। সবাই এতটা হাঁটবে কী করে? হয়তো গাড়িও চলে।"

কাকাবাবু ভাবলেন, আজ লোকজন আসেনি বলে গাড়িও চলেনি। হাঁটতে হাঁটতে তিনি এখানকার সৌন্দর্য পুরোপুরি উপভোগ করতে লাগলেন।

বিল্ বলল, "এর পিছন দিকের একটা তাঁবুতে আমার চেনা একজন লোক আছে। চলুন, তার কাছে একটু খোঁজখবর নেওয়া যাক। আমাদের থাকার ব্যবস্থাও করতে হবে। অন্ধকার হয়ে গেলে আর বেরোনোই যাবে না!"

কয়েকটা তাঁবুর পাশ দিয়ে পাশ দিয়ে কাকাবাবু হাঁটতে লাগলেন বিলের সঙ্গে।

কোথাও কোনও শব্দ নেই। একটা বেশ বড় তাঁবুর সামনে এসে দাঁড়াল বিল্। কারও নাম ধরে ডাকার বদলে দু'বার শিস দিল।

সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এল একজন দীর্ঘকায় কালো মানুষ।

দু'জনে একটুক্ষণ কথা বলার পর বিল্ কাকাবাবুর দিকে ফিরে বলল, "আপনি নিশ্চয়ই ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। আসুন, আগে একটু ভিতরে বসি। আপনি বিয়ার খাবেন?"

কাকাবাবু বললেন, "না, আমি বিয়ারটিয়ার খাই না। চা কিংবা কফি খেতে পারি।"

ভিতরে একটা ঘর সোফাটোফা দিয়ে বসবার ঘরের মতন সাজানো। কাকাবাবু একটা সোফায় বসলেন।

এবার ভিতর থেকে এল আরও দু'জন কালো মানুষ। তাদের একজন সোজাসুজি এসে কাকাবাবুর ক্রাচ দুটো সরিয়ে নিল। আর কাকাবাবু কিছু বলার আগেই অন্য দু'জন শক্ত করে চেপে ধরল তাঁর দুটো হাত। তারপর দড়ি দিয়ে তাঁর সারা শরীর পেঁচিয়ে-পেঁচিয়ে বেঁধে ফেলল।

এত তাড়াতাড়ি ব্যাপারগুলো ঘটল যে, কাকাবাবু কোনওরকম বাধা দেওয়ারই সুযোগ পেলেন না।

অবশ্য চেষ্টা করলেও তিনি এই তিনজন ষণ্ডাগুন্ডা চেহারার লোকের সঙ্গে লড়াই করতে পারতেন না।

বিল্ একপাশে দাঁড়িয়ে হাসছে। অর্থাৎ এটা বিলেরই কীর্তি? কাকাবাবু দারুণ অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

একজন মানুষের এমন দু'রকম রূপ থাকতে পারে? কাল থেকে দেখছেন, ছেলেটাকে খুবই বিনীত আর ভদ্র মনে হয়েছে। কতরকম গল্প হল, তার কলকাতায় বেড়াতে যাওয়ার কথাও হল। সে আসলে তাঁকে ভুলিয়েভালিয়ে এখানে নিয়ে এসেছে কারও কাছে ধরিয়ে দিতে! কাকাবাবু তাকে একটুও সন্দেহ করেননি।

বিল্ এবার ফস করে একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, "সরি, মি., আমার খুব টাকার দরকার। আপনাকে এখানে পৌঁছে দিলে তিরিশ হাজার ডলার দেবে। সেই টাকাটা আমার খুব দরকার ছিল!" একটু থেমে সে আবার বলল, "আপনার যথেষ্ট বয়স হয়েছে। মরে গেলেও ক্ষতি নেই। কিন্তু আমাকে আরও অনেকদিন বাঁচতে হবে। ওই টাকাটা পেলে সুবিধে হবে। তাই না!"

কাকাবাবু অপলক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

বিল্ আবার জিজ্ঞেস করল, "আমি কি ভুল বলছি?"

কাকাবাবু আস্তে আস্তে বললেন, "না, ভুল হবে কেন? টাকার লোভে কেউ কেউ তো নিজের বাবা-মাকেও খুন করে?"

বিল্ এবার চটে উঠে বলল, "খবরদার, আমার মা-বাবা নিয়ে কিছু বলবে না। তুমি একটা ইন্ডিয়ান। তুমি বাঁচলে বা মরলে আমার কিছু যায়-আসে না। তোমার সঙ্গে আমার বাবা-মায়ের তুলনা?"

কাকাবাবু বললেন, "যে লোক অন্য মানুষদের ঘৃণা করে, সে নিজের বাবা-মা-ছেলে-মেয়ে কাউকেই ভালবাসতে পারে না।"

বিল্ বলল, "শাট আপ! তোমাকে আর উপদেশ দিতে হবে না।"

কাকাবাবু তবু বললেন, "তোমাকে আর একটা উপদেশ দিতে পারি। তুমি এখানে কাজ না করে সিনেমায় নামার চেষ্টা করতে পারো। তাতেও অনেক টাকা রোজগার করতে পারবে। তুমি তো চমৎকার অভিনয় করতে পারো!"

তখনই আর-একজন লোক বেরিয়ে এল ভিতর থেকে। দেখলেই বোঝা যায়, এই লোকটিই এদের নেতা। যেমন লম্বা-চওড়া চেহারা, তেমনই একটা ঝলমলে আলখাল্লা পরা। মাথায় কোঁকড়া কোঁকড়া চুল একটা হলুদ ফিতে দিয়ে বাঁধা। চোখ দুটো টকটকে লাল, দেখলেই মনে হয় নেশাখোর।

কোমরে দু'হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে সেই লোকটি বলল, "এই সেই ইন্ডিয়ান? এ তো দেখছি একটা খোঁড়া লোক। এরই এত তেজ?"

বিল্ বলল, "হ্যাঁ স্যার। খুব ডেঞ্জারাস ম্যান। খালি হাতেই কয়েকজন সোমালিয়ার হাইজ্যাকারকে জব্দ করেছে। আমি ওকে খুব তোয়াজ করে নিয়ে এসেছি। কিছুই বুঝতে পারেনি এতক্ষণ।"

সেই লোকটি বলল, "আমি আজ গাড়ির রাস্তাটা বন্ধ করে দিয়েছি, তাতে তোমার সুবিধে হয়েছে বলো?"

বিল্ বলল, "নিশ্চয়ই। আজ একটা বেলুন নামবে, আমি জানতাম। ওর সঙ্গে আগে থেকেই ঠিক করা ছিল। আজ আর কোনও টুরিস্ট আসেনি, তাই সব দিক থেকেই আমরা ফ্রি।"

লোকটি কাকাবাবুর কাছে এসে চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, "জন্তু-জানোয়ারদের প্রতি তোমার খুব দরদ, তাই না? সব জন্তু-জানোয়ারকে বাঁচিয়ে রাখতে চাও? কেন?"

কাকাবাবু বললেন, "আপনি কে? আপনার পরিচয় তো জানি না। আপনার সম্পর্কে কিছু না জেনে আপনার কথার উত্তর দেব কেন?"

লোকটি আচমকা কাকাবাবুর গালে ঠাস করে এক চড় কষিয়ে বলল, "এইজন্য উত্তর দেবে। না হলে আরও মার খাবে।"

কাকাবাবু একবার চোখ বুজলেন। তাঁর মেজাজ শান্ত রাখতে হবে। তিনি বললেন, "নাঃ, আপনার সঙ্গে কথা বলার ইচ্ছে নেই আমার।"

লোকটি এবার কাকাবাবুর চুলের মুঠি চেপে ধরল।

কাকাবাবু জানেন, যেরকম শক্তভাবে এরা তাঁকে বেঁধেছে, তার থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় নেই। কোনওরকমে দড়ি খুলে ফেললেও, এত লোকের সঙ্গে তিনি গায়ের জোরে পারবেন না।

তবে, এদের বেশি বেশি রাগিয়ে দিলে এরা কিছু না-কিছু ভুল করে ফেলতে পারে। তাই তিনি নাক কুঁচকে বললেন, "এঃ, তোমার গায়ে বিশ্রী গন্ধ! তুমি অনেকদিন স্নান করো না বুঝি?"

লোকটি কাকাবাবুর চুলের মুঠি ধরে টানতেই বিল্ বলল, "মি. রাজা, তুমি এঁকে চেনো না। ইনি সাংঘাতিক লোক। ইনি ইচ্ছে করলে এক্ষুনি তোমাকে খতম করে দিতে পারেন। ওঁর নাম রবার্ট কিকুইউ, ইনি ফিলিপ কিকুইউ-এর ভাই। বড় বড় ব্যবসায়ী, মন্ত্রী, পুলিশও এই দুই ভাইকে ভয় পায়।"

কাকাবাবু বললেন, "বুঝেছি, এই দুই ভাই মিলেই চোরাশিকার, পশুচালানের কাজ করে বহু পশু মেরেছে, মানুষও খুন করেছে। হ্যারি ওটাংগোর মতো বিখ্যাত মানুষকে এরাই মেরেছে।"

রবার্ট কাকাবাবুর চুল ছেড়ে দিয়ে উলটো দিকের সোফায় বসল। সামনের পা দুটো ছড়িয়ে দিয়ে বলল, "হ্যাঁ, আমরা জন্তু-জানোয়ার মারি, বেশ করি। সিংহ, হাতি, গন্ডার, এরা মানুষের কী উপকার করে? পৃথিবী থেকে এদের শেষ করে দেওয়াই উচিত।"

কাকাবাবু বললেন, "আমরা মানুষ, পৃথিবীর একটা প্রাণী। এখানে আরও কতরকম প্রাণী আছে। আমরা যেমন বাঁচতে চাই, তেমনি ওদেরও বেঁচে থাকার অধিকার আছে।"

রবার্ট ধমক দিয়ে বলল, "মোটেই না। অন্য সব হিংস্র প্রাণীকে শেষ করে দিতে হবে। ওরা মানুষের ক্ষতি করে।"

কাকাবাবু বললেন, "ওদের বিরক্ত না করলে ওরা মানুষের ধারেকাছে আসে না। অন্য সব প্রাণীকে ধ্বংস করে দিলে প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট হবে। মানুষও বাঁচবে না।"

রবার্ট বলল, "যত সব বাজে কথা। ওসব খবরের কাগজে লেখে। মুরগি, হাঁস, ভেড়া, গোরু, শূকরদের যে প্রতিদিন কত মারা হচ্ছে? মানুষ এদের খায়। তা বুঝি দয়ামায়ার প্রশ্ন নেই? সিংহ আর গন্ডারের মাংস যদি আমরা খেতাম, ওদেরও বাঁচিয়ে রাখতাম। অত বড় বড় হাতি বাঁচিয়ে রাখার কী দরকার? শুধু গাছ ধ্বংস করে? বরং ওদের দাঁতগুলো মানুষের কাজে লাগে। সিংহের চামড়া দিয়ে ভাল জুতো হয়।"

কাকাবাবু বললেন, "মানুষ ক্রমশ নিরামিষাশী হয়ে যাবে। খাওয়ার জন্য কোনও প্রাণীকেই মারবে না। আমাদের ইন্ডিয়ার অনেক লোক নিরামিষ খায়।"

রবার্ট বলল, "যাক গে ওসব কথা। আসল কথাটা হল, আমার ভাই ফিলিপ এখন জেলে। লোহিয়া নামে ব্যবসায়ীটা অনেক টাকা খরচ করে ওর বিরুদ্ধে উকিল-ব্যারিস্টার লাগিয়েছে। সে নিজেও একজন প্রধান সাক্ষী। আর-একজন তুমি। তোমরা দু'জন মিলে ওকে ফাঁসি দিতে চাও? অপরাধ প্রমাণ হলে ওর নির্ঘাত ফাঁসি!"

কাকাবাবু বললেন, "না, আমি ফিলিপের ফাঁসি চাই না। কারওই ফাঁসি চাই না। যদিও সে আমার ভাইপোকে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে ফেলে পালিয়েছিল। আমরা কোনওক্রমে বেঁচেছি। সে একজন অতি নিকৃষ্ট অপরাধী। তার অবশ্যই কিছু শাস্তি হওয়া উচিত।"

রবার্ট ঠোঁট বেঁকিয়ে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল, "শাস্তি হবে না ছাই! আমরা আছি কী করতে? আমার ভাইয়ের বিরুদ্ধে প্রধান সাক্ষী দু'জন, লোহিয়া আর তুমি। খতম হবে। আর-একটা মেয়ে আছে, তার স্বামীটা আমাদের দলে ছিল। তারপর বিশ্বাসঘাতকতা করে ধরা পড়ায় তার মাথা গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। বউটা যাতে সাক্ষী দিতে না পারে, তাই তাকেও গুম করার ব্যবস্থা করেছি। ব্যস, কোনও সাক্ষী না পেলে শাস্তি হবে কী করে? জজসাহেবকেও ঘুষ খাওয়াব, বড়ভাই বেকসুর খালাস হয়ে যাবে!"

কাকাবাবু বললেন, "সবটাই এত সোজা?"

রবার্ট বলল, "তুমি যা ভাবছ, তার চেয়েও সোজা।"

বিল্ এতক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। এবার সে বলল, "মাস্টার, এবার আমার টাকাটা দিয়ে দাও। আমি চলে যাই।"

রবার্ট বলল, "ও হ্যাঁ, তোমার টাকা? কত যেন ঠিক হয়েছিল?"

বিল্ বলল, "তিরিশ হাজার ডলার।"

কাকাবাবু বললেন, "আমার জীবনের দাম মাত্র তিরিশ হাজার ডলার? অনেক বেশি হওয়া উচিত ছিল!"

বিল্ আর রবার্ট দু'জনেই কাকাবাবুর দিকে তাকাল, কিন্তু কেউ কোনও মন্তব্য করল না।

রবার্ট বিল্‌কে বলল, "তিরিশ হাজার ঠিক হয়েছিল, তাই না? এখন তোমাকে যদি আমি এক পয়সাও না দিই? মাল তো ডেলিভারি পেয়ে গিয়েছিই। এখন তোমাকে টাকা দিতে অস্বীকার করলে তুমি কী করবে?"

পকেট থেকে সে একটা রিভলবার বের করল।

বিল্-এর মুখটা পাংশু হয়ে গেল। সে কাঁদোকাঁদো গলায় বলল, "সে কী, টাকাটা দেবেন না? আমি এত কষ্ট করে নিয়ে এলাম? আমি গরিব মানুষ!"

রবার্ট বলল, "আমি জিজ্ঞেস করছি, টাকাটা না দিলে তুমি কী করবে?"

বিল্ বলল, "কী আর করব? আমার আর কতটুকু ক্ষমতা?"

রবার্ট বলল, "পাবে। তোমাকে একেবারে বঞ্চিত করব না। দামটা বেশিই দেব। এসব কাজ পাঁচ-দশ হাজারেও হয়। ঠিক আছে, তোমাকে কুড়ি দিচ্ছি। বাকি দশ রইল। আবার কখনও যদি তোমাকে কাজে লাগাতে হয়, তখন পাবে।"

একটা ব্যাগ থেকে সে কয়েক তাড়া নোট বের করে ছুড়ে দিল বিলের দিকে।

বিল্ বলল, "অন্তত আরও পাঁচ বেশি দিন স্যার!"

রবার্ট প্রচণ্ড ধমক দিয়ে বলল, "যাও!"

তারপর সে কাকাবাবুর দিকে ফিরে রিভলবারটা তুলে বলল, "ওহে, আমি তোমাকে কতরকমভাবে মেরে ফেলতে পারি, শুনবে? এক নম্বর: এক্ষুনি দুটি গুলি চালিয়ে দিতে পারি তোমার বুকে। দু'নম্বর: পাহাড়ের চূড়ায় নিয়ে গিয়ে ফেলে দিতে পারি। তিন নম্বর: হাত-পা বেঁধে ফেলে দিতে পারি লেকে। ওখানে হিপোগুলো তোমাকে নিয়ে খেলা করবে। চার নম্বর: তোমাকে নিয়ে...!"

কাকাবাবু তাকে বাধা দিয়ে বললেন, "অত কিছুর দরকার কী? তুমি আর আমি সামনাসামনি লড়াই করি কোনও অস্ত্র না নিয়ে। দেখা যাক কে জেতে?"

বিল্ এখনও যায়নি। সে তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "খবরদার স্যার, ওতে রাজি হবেন না। এ লোকটি অতি ধুরন্ধর। নিশ্চয়ই কোনও কায়দা করবে!"

রবার্ট নীচের ঠোঁট উলটে বলল, "ওসব কায়দাটায়দা আমি গ্রাহ্য করি না। আমি ইচ্ছে করলে এক্ষুনি খালি হাতে ঘ্যাচাং করে ওর মুন্ডুটা ঘুরিয়ে ওর ঘাড়টা ভেঙে দিতে পারি। কিন্তু আমি কোনও খোঁড়া লোকের সঙ্গে লড়াই করি না।" তারপর সে কাকাবাবুর দিকে তাকিয়ে বলল, "তোমায় আমি কী করে মারব জানো? তুমি জন্তু-জানোয়ারদের এত ভালবাসো। সেই জন্তুদের দিয়েই তোমাকে খাওয়াব। লেক মিগাইয়ের উলটো দিকটায় একটা স্পট আছে, তার নাম লায়ন্স ডেন। সেখানে তোমাকে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় ফেলে রেখে আসব। তুমি পালাতে পারবে না। সিংহরা জল খেতে এসে তোমাকে দেখতে পেলে জলখাবার (স্ন্যাক্স) হিসেবে খেয়ে নেবে। তখন তোমার পশুপ্রেম কোথায় থাকবে?" তারপর সে "জিম জিম," বলে একজনকে ডাকল।

সেই লোকটি এল, হাতে একটা ইঞ্জেকশনের সিরিঞ্জ। কাকাবাবুর বাধা দেওয়ার ক্ষমতা নেই। সে প্যাট করে সিরিঞ্জটা ঢুকিয়ে দিল তাঁর বাহুতে।

কাকাবাবুর মনে হল, এটা অজ্ঞান করে দেওয়ার মতন কিছু একটা ওষুধ। তাঁর চোখ টেনে আসছে। সেই অবস্থাতেও তিনি বললেন, "আমাকে মেরে ফেলতে পারো, কিন্তু লোহিয়াকে তো পাবে না! সে ঠিক...!"

রবার্ট হা-হা করে হেসে উঠল।

॥ ৮ ॥

কাকাবাবুর জ্ঞান ফিরলেও চোখের সামনে শুধু অন্ধকার দেখতে পেলেন। বুঝতে পারলেন না, কোথায় আছেন, কী অবস্থায় আছেন। একটু নড়াচড়া করতে গিয়ে বুঝতে পারলেন, দাঁড় করানো অবস্থায় কিছুর সঙ্গে বাঁধা। পা মাটি ছোঁয়নি। কোনও গাছটাছের সঙ্গেই বেঁধে রাখা হয়েছে মনে হয়।

এটাই কি সেই হ্রদের ধারে লায়ন্স ডেন?

এখন কত রাত কে জানে? কোথাও কোনও শব্দ নেই।

নাইলনের দড়ি দিয়ে এত জোর বাঁধা হয়েছে যে, সারাগায়ে জ্বালা করছে। নড়াচড়া করতে গেলে আরও জোরে লাগছে।

একবার তিনি শব্দ করে উঠলেন, "উঃ!"

সঙ্গে সঙ্গে কেউ তার নাম ধরে ডাকল, "রাজা, রাজা!"

কাকাবাবু দারুণ চমকে উঠলেন।

এ গলার আওয়াজ তো তাঁর চেনা। সত্যি কেউ তাঁকে ডাকল, না স্বপ্ন দেখছেন তিনি?

তবু বললেন, "পওয়ন পওয়ন, তুমি কোথায়?"

এবার পাশ থেকেই উত্তর এল, "আমি তোমার খুব কাছেই আছি। একাই আছি।"

কাকাবাবু খানিকটা নিরাশভাবে বললেন, "তুমিও ধরা পড়েছ? আমি আশা করেছিলাম, তুমি কোথাও লুকিয়ে আছ। ওরা তোমার সন্ধান পাবে না।"

পবনরতন লোহিয়া বললেন, "আমি তো পালাবার সময়ই পেলাম না। আমার একজন খুব বিশ্বস্ত বডিগার্ড ছিল। এখানে তো ঘুষের রাজত্ব চলে। কিন্তু কেউ হাজার হাজার ডলার খাইয়েও তাকে দলে টানতে পারত না। কিন্তু সে দু'দিন অসুস্থ ছিল। আর-একজন ভার নিয়েছিল। অমনি সেই সুযোগে ওরা নতুন লোকটিকে হাত করে ফেলে।"

"তোমার বাড়িতে আগুন লেগেছে, তুমি জানো? অত সুন্দর বাড়িটা একেবারে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে?"

"জানব না কেন? ঘুমের মধ্যে তিন-চারজন আমার মুখ বেঁধে, কাঁধে তুলে বাইরে নিয়ে যায়। তারপরেই বাড়িটায় আগুন লাগায়।"

"সেই থেকে তুমি এখানেই আছ?"

"হ্যাঁ, রাজা। মাঝে মাঝেই ইঞ্জেকশন দিয়ে অজ্ঞান করে রেখেছে। কিছু খেতেও দেয়নি।"

"তোমাকে যে মাঝেমধ্যে অন্য কোথাও একা-একা দেখা গিয়েছিল, সেসব কি এদেরই রটনা?"

"হ্যাঁ, পুলিশকে হাত করে রটিয়েছে নিশ্চয়ই! ঘুষে এখানে কী না হয়? এমনকী, নিজের ভাইকেও অনেক সময় বিশ্বাস করা যায় না। আমার একটা ভাই, আপন ভাই নয়। সেও বোধহয় আমার সম্পত্তির লোভে এদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। তুমি কী করে ধরা পড়লে?"

"পওয়ন, আমি একজন পুলিশকে বিশ্বাস করেছিলাম। সে ছেলেটির প্রথম থেকেই ভদ্র ব্যবহার, বিশ্বাস না করে উপায়ই ছিল না। আমি একটুও সন্দেহ করিনি।"

"সত্যিই, এক-একজনকে দেখলে একটুও সন্দেহ করা যায় না। রাজা,

তোমার আর দু'দিন আগে আসবার কথা ছিল, তুমি ঠিক সময় এলে আমরা দু'জনে একসঙ্গে থাকতাম। আমাদের ধরা অত সহজ হত না বোধহয়।"

"কী করব, আগে আসা গেল না! নানারকম কাণ্ড হল। সেসব তো পরে বলব!"

"পরে বলবে মানে? কখন? আমরা কি আর এখান থেকে বেঁচে ফিরতে পারব? অবশ্য এখন আর কিছু বলা না বলা সমান। আর কতটুকু সময় পাব জানি না!"

"কেন পওয়ন, আমরা কি এত সহজে মরব নাকি? না না। তুমি ওসব ভেবো না। একটা কিছু ব্যবস্থা হবে!"

"এখন আর কী ব্যবস্থা হতে পারে? এই দড়ির বাঁধন ছেঁড়া অসম্ভব।"

"মনে করো, এতদিন পর এই আগ্নেয়গিরি আজই আবার জেগে উঠল। প্রথম প্রথম তো একটু একটু আগুন জ্বলবে। সেই আগুনে আমরা দড়ি পুড়িয়ে ফেলব। তারপর দৌড়োব। ওঃ হো, আমি তো আবার খোঁড়া পায়ে দৌড়োতেও পারব না। সেটা একটা মুশকিল!"

"রাজা, তোমার মাথায় এসবও আসে? আগ্নেয়গিরি জেগে উঠে আমাদের বাঁচাবে?"

"তুমি যাই বলো পওয়ন, সিংহের পেটে আমি মরব না, এটা আমার দৃঢ় বিশ্বাস।"

"তুমি কি জ্যোতিষ ট্যোতিষে বিশ্বাস করো নাকি?"

"না না, সেসব নয়। কিন্তু এত দেশ ঘুরলাম, এতরকম বিপদ কাটিয়ে এলাম, শেষ পর্যন্ত এই গোরোংগোরোর মধ্যে সিংহ আমায় খেয়ে ফেলবে, এ আবার হয় নাকি?"

"সিংহ না খাক, চিতা যদি আসে, সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়বে। কিংবা সাপ কামড়াতে পারে।"

"সিংহের চেয়ে বোধহয় সাপ ভাল, তাই না? কষ্ট কম হবে!"

"রাজা, এই সময়েও তুমি হাসছ?"

"মরতে যদি হয়, তবে কাঁদতে কাঁদতে মরার চেয়ে হাসতে-হাসতে মরাই তো ভাল!"

কেউ কাউকে দেখতে পাচ্ছেন না, অন্ধকারে কথা বলছেন দু'জনে। খানিক পরে কীসের যেন শব্দ হল। নিশ্চয়ই কোনও জন্তু আসছে। দেখা গেল দুটো জ্বলজ্বলে চোখ। বেশ উঁচুতে। অর্থাৎ কোনও বড় জানোয়ার। দু'জনেই নিশ্বাস

বন্ধ করে চুপ করে রইলেন। জন্তুটা একটু ঘুরে এসে বসে রইল। কয়েক মিনিট পরে পবন লোহিয়া ফিসফিস করে বললেন, "মনে হয় ওটা গন্ডার। তাই কাছে আসছে না।"

কাকাবাবুও ফিসফিস করে বললেন, "না, ওটা সিংহই।"

"তুমি কী করে বুঝলে?"

"চোখের রং দেখে। লাল চোখ। সিংহের চোখে আয়নার মতো একটা ব্যাপার থাকে, তাকে বলে 'টেপটার্ন'। তাতে শুধু লাল রংটাই প্রতিফলিত হয় অন্ধকারে। রাত্তিরে এক-একটা জন্তুর চোখের রং এক-এক রকম। শিয়ালের চোখ সবুজ।"

"তুমি এত সব জানলে কী করে, রাজা?"

"একসময় বনে-জঙ্গলে অনেক ঘুরেছি। তা ছাড়া বইতেও পড়েছি।"

"সিংহ যদি হয়, আমাদের কামড়াতে আসছে না কেন?"

"অন্ধকারে তো বুঝতে পারছি না, ওটা সিংহ না সিংহী। সাধারণত সিংহরা শিকার করে না, তারা বসে থাকে, সিংহীই এসে শিকার করে। এটা যদি সিংহ হয়, তা হলে নিশ্চয়ই সিংহীর জন্য অপেক্ষা করছে!"

"সিংহ এলে সিংহী তো বেশি দূরে থাকবে না। এসে পড়বে এক্ষুনি।"

"আসুক আগে, তারপর দেখা যাবে। এর মধ্যে যদি একটা হরিণ কিংবা জেব্রা এসে পড়ে, তা হলে ওরা সেটাকেই খাবে, আমাদের দিকে আর তাকাবে না।"

"সেজন্য কি ভগবানকে ডাকবে, এদিকে একটা জেব্রা পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য?"

"ভগবান এখন ঘুমোচ্ছেন। আমাদের ডাক শুনতে পাবেন না।"

"আমরা কথা বলছি, নিশ্চয়ই শুনতে পাবে সিংহটা।"

"শুনতে না পেলেও গায়ের গন্ধ তো এতক্ষণে পেয়ে যাওয়া উচিত। পেয়েছে নিশ্চয়ই।"

সিংহ সাধারণত ডাকে না। এই সময় হঠাৎ ডেকে উঠল। সে ডাক শুনে যত বড় সাহসীই হোক, তারও বুক কাঁপবে। কাকাবাবুরও বুক কেঁপে উঠল। তবু তিনি ভয় কাটিয়ে হালকা গলায় বললেন, "দেখলে, দেখলে তো, চোখ দেখে বুঝেছিলাম, সিংহ!"

পবন লোহিয়া কথাই বলতে পারছেন না আর।

সিংহটা গরগর করতে করতে এগিয়ে আসতে লাগল এদিকে।

আর নিস্তার নেই। এবার সিংহটা কার উপর আগে লাফিয়ে পড়বে?

কাকাবাবুর দিকে না এসে সিংহটা গেল পবন লোহিয়ার দিকে।

পবন কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন, "গুড বাই, রাজা। সরি, আমিই তোমায় এবার ডেকে এনেছিলাম। তবে, তোমার এখনও আশা আছে। সিংহটা আমায় খেলে ওর পেট ভরে যাবে, তখন আর তোমাকে খাবে না।"

কাকাবাবু বললেন, "এর পর সিংহীটা পেটে খিদে নিয়ে আসবে।"

সিংহটা এসে পড়ল পবন লোহিয়ার খুব কাছে। গর-র গর-র করেই চলেছে।

কাকাবাবু এখনও বিশ্বাস করতে পারছেন না যে, তাঁর আগে পবন লোহিয়ার মৃত্যু হবে। তাঁকেই আগে খাওয়া উচিত ছিল। পবনের মৃত্যু-আর্তনাদ তিনি সহ্য করবেন কী করে?

তাঁর চোখে জল এসে গেল।

একটুক্ষণ পরে পবন লোহিয়া মৃত্যু-চিৎকারের বদলে অন্যরকমভাবে চিৎকার করে বলল, "আরে, এ তো সিম্বা!"

কাকাবাবু বুঝতে না পেরে বললেন, "তার মানে?"

পবন বললেন, "এটা তো আমার পোষা সিংহ। আমার নিজস্ব চিড়িয়াখানায় থাকে।"

কাকাবাবু তবু একটু অবিশ্বাসের সুরে বললেন, "তোমার চিড়িয়াখানা? আগুন লাগার পর জন্তু-জানোয়াররা পালিয়েছে। কিন্তু মাত্র তিন-চারদিনের মধ্যে এই সিংহটা তো কেনিয়ার বাড়ি থেকে এত দূরে এই গোরোংগোরোর মধ্যে চলে এল? তা কি সম্ভব?"

পবন বললেন, "না, তা নয়। এই সিম্বাটা খুব ছোট ছিল। যথেষ্ট বড় হওয়ার পর আমি ওকে সেরেংগেটি জঙ্গলে ছেড়ে দিয়ে গিয়েছি ন'মাস আগে। সেখান থেকে এখানে চলে এসেছে। আমাকে ঠিক মনে রেখেছে। দ্যাখো, আমি ওর গলায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছি। গর-র গর-র শব্দটা করছে, সেটা আনন্দের।"

কাকাবাবুর বুক থেকে একটা বিরাট স্বস্তির নিশ্বাস বেরিয়ে এল। যেন সাক্ষাৎ মৃত্যুর গ্রাস থেকে ফিরে আসা।

তিনি বললেন, "দ্যাখো পওয়ন, বলেছিলাম কিনা সিংহের পেটে আমার মৃত্যু হবে না?"

পবন বললেন, "সত্যিই, এটা আশ্চর্যভাবে মিলে গিয়েছে। কিন্তু এই দড়ির বাঁধন থেকে মুক্তি পাব কী করে?"

কাকাবাবু বললেন, "এটা যদি হিন্দি সিনেমা হত, তা হলে তোমার পোষা সিম্বা দাঁত দিয়ে কামড়ে দড়িগুলো সব কেটে দিত। কিন্তু সিম্বা বেচারা তো হিন্দি সিনেমা দেখেনি, ও জানবে কী করে যে দড়িটড়ি কাটতে হবে!"

এবারে পবন লোহিয়াও হেসে ফেলে বললেন, "সিংহটা হিন্দি সিনেমা দেখবে, তোমার মাথাতেও আসে বটে!"

কাকাবাবু বললেন, "একটা সিংহ যখন কামড়ায়নি, তখন অন্য সিংহরাও আমাদের কামড়াবে না ধরে নিতে পারি। ওরা সব জেনে যাবে। এর পর কী হয় দেখা যাক! সিম্বা চলে গিয়েছে?"

"চলে গেল এইমাত্র।"

"যেখানে সিংহ আসে, সেখানে অন্য হিংস্র জানোয়ার সহজে আসে না। হাতি আসতে পারে। হাতির পাল এলে সবাই জায়গা ছেড়ে দেয়।"

"হাতির পাল এলে আমাদের কিছু সুবিধে হতে পারে?"

"হতে পারে। যে গাছের সঙ্গে আমরা বাঁধা, হাতি হয়তো সেই গাছ উপড়ে ফেলে দিতে পারে।"

"তারপর পা দিয়ে আমাদের পিষে দেবে?"

হঠাৎ শোনা গেল গুলির শব্দ। কতটা দূরে তা বোঝা গেল না। পাহাড়ের দেওয়ালে প্রতিধ্বনিত হলে সেই শব্দ খুব জোর মনে হয়। পায়রারা উড়ে গেল কয়েকবার। তারপর আবার সব নিঃশব্দ!

পবন জিজ্ঞেস করলেন, "রাজা, কিছু বুঝলে? কী হল ব্যাপারটা?"

কাকাবাবু বললেন, "চোরাশিকারিদের কাণ্ড? কোনও জানোয়ার মারছে? তবে শুনেছিলাম, পুলিশ এখানে খুব কড়া পাহারা দেয়?"

পবন বললেন, "পুলিশের নাকের ডগাতেই এসব হয়। হাতির দাঁত, গন্ডারের শিং, চামড়া, এসবের প্রচুর দাম আছে।"

আবার সব চুপচাপ। কত সময় কেটে যাচ্ছে কে জানে। দু'-একবার শুধু শোনা গেল হায়েনার ডাক।

কাকাবাবু আর পবনের কথা প্রায় ফুরিয়ে গিয়েছে। দু'জনেরই ঘুমঘুম চোখ।

একসময় উপরের আকাশে ফুটে উঠল একটু একটু আলো। ডাকতে

লাগল পাখি। একটা পাখির ডাক অনেকটা ময়ূরের মতো জোরালো, কিন্তু ঠিক ময়ূর নয়।

সেই পাখির ডাকেই সজাগ হলেন কাকাবাবু। এবার আবছা সোনালি আলোয় দেখতে পেলেন, পবন সাদা প্যান্ট আর গলাবন্ধ কোট পরা, মুখে কয়েকদিনের খোঁচা খোঁচা দাড়ি, চোখ দুটো ঢুকে গিয়েছে। কত বড় বড় কোম্পানির মালিক, কত লোকের উপকার করেন, তাঁর আজ এই অবস্থা!

কোথা থেকে অনেক প্রজাপতি ফরফর করে উড়ে এল। লেকটার ধারে ধারে অজস্র ফুল। কোথাও কোনও হিংসার চিহ্ন নেই। কাকাবাবুর মনে হল, পৃথিবী কী সুন্দর!

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আবার শোনা গেল দুমদুম করে শব্দ। এবারে দূরে নয়। গুলির শব্দও নয়। একদিকটা দেখা গেল ধোঁয়ায় ভরে গিয়েছে।

কাকাবাবু বুঝতে পারলেন, এগুলো স্মোক বম্ব। এই বোমায় জন্তু-জানোয়ার সব দূরে সরে যায়।

এই বোমা ফাটাতে ফাটাতে কারা আসছে?

নিশ্চয়ই রবার্ট আর তার লোকজন। সিংহের পেটে এই দু'জন গিয়েছে কি না, তাই দেখতে আসছে। যখন দেখবে দু'জনেই বেঁচে আছে, তখন কি এখানেই গুলি করে মারবে, না আবার সেই তাঁবুতে নিয়ে যাবে?

দিনেরবেলা আজ কিছু টুরিস্ট আসতে পারে এখানে, সুতরাং এখানে এই অবস্থায় বেঁধে রেখে যাবে না।

কাকাবাবু দেখতে পেলেন, ধোঁয়া ভেদ করে বেরিয়ে আসছে মানুষ। প্রত্যেকেরই হাতে রাইফেল। প্রথম লোকটিই বিল্, তার লাল শার্ট দেখে চেনা যায়।

বাকি দশ হাজার ডলার পাওয়ার জন্য বিল্ এখন ওদের হয়ে গিয়েছে।

পবন বললেন, "ওই যে ওরা আসছে রাজা, এবার মৃত্যুর জন্য তৈরি হও। আর ওরা আমাদের ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য পরিশ্রম করবে না।"

কাকাবাবু বললেন, "কিছুই বলা যাবে না। আমাদের বাংলায় একটা কথা আছে, 'যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ।' আশ মানে আশা। দেখা যাক।"

একেবারে কাছে এসে বিল্ বলল, "গুড মর্নিং সার্স! আমি একটা ছুরি দিয়ে আপনাদের বাঁধন কেটে দেব। কিন্তু তারপরই আপনারা আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়বেন না। এখন আমি আপনাদের শত্রু হিসেবে আসিনি। বন্ধু হয়ে এসেছি।"

কাকাবাবু বললেন, "তাই নাকি? হঠাৎ আবার ডিগবাজি? কাল বিকেল পর্যন্ত আমার বন্ধু ছিলে, তারপর টাকার লোভে আমাকে বিক্রি করে দিলে। এখন আবার বন্ধু সাজতে চাইছ কেন?"

বিল্ বলল, "বুঝিয়ে দিচ্ছি। টাকার লোভেই আপনাকে কাল বিক্রি করেছিলাম। এখন আবার টাকার লোভেই আপনাদের মুক্তি দিতে এসেছি।"

পবন লোহিয়া এবার প্রচণ্ড ধমক দিয়ে বললেন, "হেঁয়ালি না করে, আসল কথা বলো! রবার্ট আমার কাছে টাকা চাইছে? এক পয়সাও দেব না।"

বিল্ বলল, "মাপ করবেন স্যার। রবার্ট গুরুতর আহত। টাকা চাইবার মুখ তার আর নেই। টাকা পাব আমরা, আমি আর এই তিনজন পুলিশ।"

ছুরি দিয়ে সে পবন ও কাকাবাবুর দড়ির বাঁধন কেটে দিল। তারপর বলল, "স্যার, আপনাদের জন্য কফি আর ব্রেকফাস্ট তৈরি করে রেখেছি। তারপর বেলুনেই ফিরে যাবেন। সোজা নাইরোবি। সব ব্যবস্থা হয়ে আছে।"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "হঠাৎ এত খাতির শুরু করলে কেন, ঠিক করে বলো তো?"

বিল্ বলল, "আপনি তো কাল দেখলেন স্যার, রবার্টটা কীরকম নিমকহারাম। তিরিশ হাজার ডলার দেবে বলেছিল, কথার খেলাপ করে দিল কুড়ি হাজার। তখন থেকেই আমি রাগে ফুঁসছিলাম। পুলিশক্যাম্পে গিয়ে অন্যদের সঙ্গে সেই কথা আলোচনা করেছি। ওদের একজন একটা দারুণ কথা বলল। এই পবন লোহিয়া সম্পর্কে কোনও সংবাদ জানাতে পারলে একটা বিরাট পুরস্কার ঘোষণা করেছে ওঁর এক ভাই। আমরা যদি পবন লোহিয়াকে রবার্টদের কাছ থেকে উদ্ধার করে নিরাপদে পৌঁছে দিয়ে আসতে পারি, তা হলে সেই পুরস্কারের টাকা অনায়াসে আমরা চারজনে ভাগ করে নিতে পারি। সেটা হবে অনেস্ট উপার্জন, তাই না?"

পবন বললেন, "সেটা তো আগেই করতে পারতে?"

বিল্ বলল, "আগে ঠিক জানতাম না আপনাকে কোথায় রেখেছে। কাল রাত্তিরে সব জানলাম। তাই আমরা চারজন প্ল্যান করে শেষ রাত্তিরে আজ রবার্টের ডেরায় গিয়ে হানা দিলাম। ওরা তৈরি ছিল না, আমাদের দেখে প্রথমে কোনও সন্দেহ করেনি।"

কাকাবাবু বললেন, "হ্যাঁ, আমরা গোলাগুলির আওয়াজ শুনেছি।"

বিল্ বলল, "ওরা সবক'টা দারুণ আহত। বেঁধে রেখে এসেছি। আপনাদের

খুবই কষ্ট হয়েছে স্যার, সেজন্য আমি ক্ষমা চাই। এর মধ্যেই যে কোনও সিংহ এসে আপনাদের উপর থাবা বসায়নি, সেজন্য ভগবানকে ধন্যবাদ!"

এতক্ষণ ধরে বেঁধে রাখার জন্য সারা শরীর আড়ষ্ট হয়ে গেছে। কাকাবাবু আর লোহিয়া দু'জনেই দু'হাত ওপরে আর নীচে করলেন কয়েকবার।

বিল্ যাতে বুঝতে না পারে, এজন্য কাকাবাবু হিন্দিতে লোহিয়াকে বললেন, "এই বিল্ নামের লোকটা আমাদের মুক্তি দিল বটে, কিন্তু ওর দিকে তাকাতেই আমার ঘেন্না হচ্ছে।"

লোহিয়া একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "কেন?"

কাকাবাবু বললেন, "লোকটা দারুণ অর্থলোভী। ও ন্যায়-নীতি কিছু বোঝে না। শুধু টাকা আর টাকা! আগের দিন কত ভাল ব্যবহার করেছিল আমার সঙ্গে। কী বিনীত ভাব। আমি তখন একটুও বুঝতে পারিনে যে ও লোকটা পুরো ছক কষে আমাকে এখানে টেনে এনেছে রবার্টের কাছে বিক্রি করে দেবার জন্য। কী নির্লজ্জ। রবার্ট ওকে কিছু টাকা কম দিয়েছে বলে এখন আবার রবার্টকে মেরে আমাদের মুক্তি দিতে এসেছে, আরও বেশি টাকা পাবার জন্য। আপনাকে ফেরত পাবার জন্য ভাই অনেক টাকার পুরস্কার ঘোষণা করেছে। সেই টাকাটা এই বিল্ পাবে ভেবে আমার খুব খারাপ লাগছে!"

লোহিয়া বললেন, "তুমি ঠিকই বলেছ। এদের বিবেক বলে কিচ্ছু নেই। কিন্তু পুরস্কারের টাকা যখন ঘোষণা করা হয়ে গেছে, তখন তো এদের দিতেই হবে। অস্বীকার তো করা যাবে না!"

কাকাবাবু বললেন, "ঠিক আছে। টাকাটা ওকে দেওয়া হোক। তারপর আমি সবার সামনে ওর দু'গালে দুটো থাপ্পাড় কষাব। ও আমাকে অপমান করেছে। আমাকে কেউ অপমান করলে আমি প্রতিশোধ না নিয়ে ছাড়ি না।"

লোহিয়া বললেন, "এখন অন্তত তোমার রাগটা একটু সামলে রাখো। আগে আমাদের বিশ্রাম নেওয়া দরকার।"

বিল্ কাছে এসে বললেন, "চলুন স্যার। আজই আমরা এখান থেকে চলে যাবার ব্যবস্থা করব।"

কাকাবাবুর দিকে ফিরে সে বলল, "মি. রায়চৌধুরী, এখান থেকে খানিকটা হেঁটে যেতে হবে। এদিকে গাড়ি আসে না। আপনার কষ্ট হবে। কিন্তু কোনও উপায় নেই।"

কাকাবাবু বললেন, "আমার ক্রাচদুটো থাকলে কোনও অসুবিধে হত না—"

লোহিয়া বললেন, "তাই তো ক্রাচ ছাড়া তুমি হাঁটবে কী করে? দু'জন লোক যদি তোমাকে ধরে ধরে নিয়ে যায়—"

বিল্ বললেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, সে ব্যবস্থা করতে পারি। আমি ডাকছি।"

কাকাবাবু তাকে বাধা দিয়ে বললেন, "আমার লোক দরকার নেই। আমি এক পায়ে লাফিয়ে লাফিয়েই যাব। চলো—"

বিল্ বললেন, "তাড়াতাড়ি এ জায়গাটা পার হতে হবে। কখন আবার সিংহ টিংহ এসে পড়ে।"

ভোরের আলো ভাল করে ফুটো গেছে। আকাশটা যেন বেশি বেশি সুন্দর দেখাচ্ছে আজ।

সবাই মিলে হ্রদের ধার দিয়ে লাইন করে এগোতে লাগল। এক পায়ে লাফাতে লাফাতে এগোতে কাকাবাবুর যে কত কষ্ট হচ্ছে, তা অন্য কারুকে তিনি বুঝতে দিলেন না।

মিনিট পাঁচেক যাবার পরই একটা দারুণ কোলাহল শোনা গেল। কারা যেন এই দিকেই ছুটে আসছে।

হয়তো আহত রবার্টসই অন্য লোকজন জোগাড় করে আসছে। বিলের সঙ্গী পুলিশ তিনজন রাইফেল বাগিয়ে দাঁড়াল।

দু'-এক মিনিট পরেই দেখা গেল, পুলিশ নয়, একদল মাসাই ছুটে আসছে এদিকে। অন্তত পঁচিশ-তিরিশজন তো হবেই। তাদের সকলেরই হাতে বর্শা আর ঢাল।

দারুণ ভয় পেয়ে বিল্ বলে উঠল, "ওরে বাবা রে! ওরা কেন আসছে!"

একজন পুলিশ বলল, "বোধহয় কোনও সিংহকে তাড়া করেছে।"

কিন্তু কোনও সিংহ কিংবা আর কোনও প্রাণীকে দেখা গেল না। মাসাইরা দুর্বোধ্য ভাষায় চিৎকার করতে করতে এসে ঘিরে ফেলল এই দলটাকে।

পুলিশরা বন্দুক চালাতে সাহস করল না। সবাই জানে, একজন মাসাইকে মারলে শত শত মাসাই এসে প্রতিশোধ নিতে চাইবে।

এখন চুপচাপ থাকাই ভাল। দেখাই যাক না এরা কী চায়।

মাসাইরা তিনজন পুলিশ আর বিল্‌কে টানতে টানতে এক জায়গায় নিয়ে দাঁড় করাল। বিল্ কিছু বলতে যেতেই ওদের যে সর্দার সে বিলের চুলের মুঠি ধরে ঝাঁকানি দিল একবার। তারপর সেই সর্দার এসে দাঁড়াল কাকাবাবুর

সামনে। সর্দারটি যেমন লম্বা, তেমনই চওড়া। একটা আলখাল্লা পরা, গলায় অনেক পুঁতির মালা।

সে কাকাবাবুর দিকে অপলক ভাবে তাকিয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত।

কাকাবাবুর বুকটা কেঁপে উঠল একবার। এই বিশাল চেহারার মানুষটি যদি তাঁকে মারতে শুরু করে কিংবা বুকে বর্শা বিঁধিয়ে দেয়, তিনি আত্মরক্ষা করবেন কী করে?

সর্দারটি কী যেন বলল কাকাবাবুকে। দুর্বোধ্য ভাষা, তিনি কিছুই বুঝলেন না।

তিনি তাকালেন লোহিয়ার দিকে।

লোহিয়া সোয়াহিলি ভাষা জানেন। তিনি এবার সর্দারকে কিছু বললেন।

সর্দার সরে গেল লোহিয়ার দিকে। তারপর দু'জনে বেশ কিছুক্ষণ কথা হল। কাকাবাবু দাঁড়িয়ে রইলেন নিঃশব্দে।

হঠাৎ একসময় কথা থামিয়ে সর্দারটি আবার কাকাবাবুর কাছে এসে হাত রাখল তাঁর ঘাড়ে।

কাকাবাবু চমকে পিছিয়ে যাবার চেষ্টা করতেই লোহিয়া বললেন, "নড়বেন না, নড়বেন না।"

সর্দারটি কাকাবাবুর ঘাড়ে দু'বার চাপড় মেরে ঘুরে দাঁড়াল। তারপর চিৎকার করে কিছু বলতেই সবাই ফিরতে শুরু করল। সঙ্গে করে নিয়ে গেল বিল্ আর অন্য পুলিশদের।

এক মিনিটের মধ্যে জায়গাটা পুরো ফাঁকা হয়ে গেল।

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "কী ব্যাপারটা হল বলুন তো লোহিয়াজি?"

লোহিয়া হাসিমুখে বললেন, "আমরা মুক্ত! আমাদের আর কেউ বিরক্ত করবে না।"

কাকাবাবু বললেন, "মুক্ত? ফ্রি? কী করে হল?"

লোহিয়া বললেন, "এই জায়গাটায় কোনওরকম গোলাগুলি চালানো নিষেধ। আগ্নেয়গিরির মধ্যে বেশি আওয়াজ হলে পরিবেশ নষ্ট হতে পারে। শেষ রাতে রবার্ট আর বিলের দলের মধ্যে গুলি চলেছে, সে আওয়াজ তো আমরাও শুনেছি। মাসাইরা এই আওয়াজ সহ্য করতে পারে না। সেইজন্য ওরা বিলের দলকে ধরে নিয়ে গেল, এখন ওদের বিচার আর শাস্তি হবে।"

কাকাবাবু বললেন, "আর আমাদের ছেড়ে দিল?"

লোহিয়া বললেন, "আমি সব ঘটনাটা জানালাম। আমাদের তো কোনও

দোষ নেই। আমরা বিদেশি বলে, আমাদের খাতির করে গেল। আপনার কাঁধ চাপড়ানো সেই জন্য! শুধু তাই নয়, আপনার হাঁটতে কষ্ট হবে বলে ও আমাদের জন্য দুটো ঘোড়া পাঠিয়ে দেবে বলল। একটু বাদেই ঘোড়া দুটো এসে যাবে!"

কাকাবাবু দু'হাত ছাড়িয়ে বললেন, "আঃ, কী ভাল লাগছে। তার মানে, ওই হতভাগা বিল্‌টাকে আপনার পুরস্কারের টাকা দিতে হবে না?"

লোহিয়া বললেন, "না! আর কেন ও টাকা পাবে? ও তো আমাদের উদ্ধার করে নাইরোবি পৌঁছে দিচ্ছে না। তা ছাড়া, মাসাইদের হাতে ওরা এখন কী শাস্তি পাবে কে জানে।"

কাকাবাবু বললেন, "বেশ হয়েছে!"

তারপরই আবার সঙ্গে সঙ্গে বললেন, "আপনার এই পুরস্কারের টাকাটা এই মাসাইদের দেওয়া উচিত। ওরাই তো আমাদের সম্মানের সঙ্গে মুক্তির ব্যবস্থা করল!"

লোহিয়া বললেন, "আমি ওদের জন্য একটা হাসপাতাল বানিয়ে দেব, আগেই ঠিক করেছি।"

কাকাবাবু বললেন, "হাসপাতাল করে দেবেন, তা ভাল কথা। আপনার পুরস্কারের টাকাটাও এই মাসাইয়ের দলটাকে ভাগ করে দেওয়া উচিত।"

লোহিয়া বললেন, "ঠিক আছে। তাও দেব!"

কাকাবাবু বললেন, "আমার পা খোঁড়া, না হলে এখন একটু নাচতাম।"

পবন লোহিয়া লেকের কাছে গিয়ে এক আঁজলা জল তুলে নিয়ে বললেন, "পৃথিবীতে এত হিংসে, হানাহানি, তবু পৃথিবীটা বড় সুন্দর!"

পাশে দাঁড়িয়ে কাকাবাবু বললেন, "বেঁচে থাকাটাই বড় সুন্দর। ইট ইজ ওয়ান্ডারফুল টু বি অ্যালাইভ!"

সমাপ্ত

পুনশ্চ: রবার্ট কিকুইউ-কে খুবই আহত অবস্থায় ভরতি করা হয় হাসপাতালে। সেখানে পরের দিনই তার মৃত্যু হয়। কাকাবাবু আর পবন লোহিয়া নাইরোবিতে পৌঁছোবার পর, দু'দিন পরেই শুরু হয় ফিলিপ কিকুইউ-এর নামে মামলা। ন'দিন বিচার চলে। তারপর তার সারা জীবনের জন্য কারাদণ্ড হয়।

তখন কেউ কেউ সেই দণ্ড শুনে বলেছিলেন, "ও মোটেই সারা জীবন জেলে থাকবে না। নানা জায়গায় ঘুষ দিয়ে ঠিক বেরিয়ে আসবে।" কিন্তু বিচার শেষ হওয়ার পাঁচদিন পরেই সে জেলের মধ্যে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করে।

এই দুই দুর্দান্ত অপরাধীর মৃত্যুর পর কেনিয়া-তানজানিয়ায় চোরাশিকার আর পশুচালান প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। পুলিশও অনেক সংযত হয়েছে।